জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ স্মরণে বিশেষ সংখ্যা
বুলেটিন নং ২৩, ৫ম বর্ষ, ১০ই নভেম্বর, '৯৫, শুক্রবার

JUMMA SAMBAD BULLETIN

A Souvenir of 10th November, 1983
Issue No. 23, 5th Year, 10th Nov., 1995, Friday

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

জন্মঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ ইং, মৃত্যুঃ ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ ইং

"পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান"

জনসংহতি সমিতি

"পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতি অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল হইবে।"

এম, এন, লারমা

জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ

"যারা বাংলাদেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে এবং যারা গণতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও প্রকৃত জাতীয়তাবাদী তারা অবশ্যই এই স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষে সমর্থন জানাবেন।"

জে, বি, লারমা

বিশেষ সাক্ষাৎকার, ভোরের কাগজ

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২
এম এন লারমার সংসদীয় জীবন ও চিন্তা ঃ	● শ্রী উদয়ন	৩
জুম্ম জাতি	● শ্রী এস, বোস জার্নাল	১৪
প্রসঙ্গ ঃ মোনঘর শিশু সদন (অনাথ আশ্রম)	● শ্রী সুপ্রিয়	১৫
বিভেদপন্থীদের ক্ষমা নেই	● শ্রী উজ্জ্বল	২০
অনুভূতি	● শ্রী ধনেশ্বর	২২
খগেনের স্মৃতি	● শ্রী মুকুল	২৩
আপোষহীন সংগ্রামী জীবনের কিছু কথা	● শ্রী নিটো	২৫
চার কুচক্রী	●	২৮
তাদের স্মরণে	● শ্রী কিশোর	২৮
দুলাগোষ্ঠী ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা	● শ্রী জগদীশ	২৯
নারী মুক্তি প্রসঙ্গে এম. এন. লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মনারী নির্যাতন	● শ্রীমতি পল্লবী	৩২
Autonomy for peace in the Chittagong Hill Tracts (CHT) Bangladesh.		৩৮
Why Shall I Not Resist!	● **Kabita Chakma**	৪০

সম্পাদকীয়

অধিকারহারা চিরনিপীড়িত সাড়ে ছয় লক্ষাধিক জুম্ম জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মবিসর্জিত মুক্তি-কামী বীর জুম্ম শহীদদের বিষাদময় স্মৃতি নিয়ে ১০ ই নভেম্বর '৯৫ আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত। জুম্ম জাতির পথপ্রদর্শক, জুম্ম জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত ও জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আজ দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতির শহীদ দিবস। তাই সর্বত্যাগী মহান নেতা ও আত্মবলিদানে মহীয়ান অমর শহীদদের হারানো ব্যথায় সমগ্র জুম্ম জাতি আজ শোকবিহ্বল। শোকময় এই দিনে সমগ্র জুম্ম জাতি ও জনসংহতি সমিতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছে মৃত্যুঞ্জয়ী মহান নেতাসহ সকল শহীদদের প্রতি। আর সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাচ্ছে প্রিয়জনহারা শোকসন্তপ্ত সকল শহীদদের আত্মীয়-স্বজনদের। আর সেই সাথে সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে যারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে পঙ্গুত্ব বরণ করে দুর্বিসহ জীবনযাপন করছে এবং শত্রুর কারাগার ও বন্দীশালায় তিলে তিলে নির্যাতন ভোগ করে মুক্তির প্রহর গুণছেন তাদের সকলের প্রতি।

১০ ই নভেম্বর '৮৩ এই দিনটি হচ্ছে জুম্ম জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বিষাদময়, শোকাচ্ছন্ন ও বেদনাদায়ক দিন। এই দিনে বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে পার্টির সর্বময়ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে মহান নেতা ও তাঁর আটজন সহযোগী শুভেন্দু, অপর্ণা, কল্যাণ, অমর ক্রান্তি, পরিমল, মণিময়, অর্জুন ও সৌমিত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকান্ডের মাধ্যমে চার কুচক্রীরা জাতীয় জীবনে চরম দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সূচনা করে। ফলতঃ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন হয়েছে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত, চার কুচক্রীদের নিষ্ঠুরতায় ও হিংস্রতায় জুম্ম জনগণ হয়েছে জর্জরিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। অনেক দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী যোদ্ধাকে এই যুদ্ধে নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। আর এই গৃহযুদ্ধের সুযোগে উগ্রজাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী গোষ্ঠী অনেক ফায়দা লুঠে নিয়েছে।

প্রতি বছর ১০ ই নভেম্বর মহান নেতাসহ অমর শহীদদের গৌরবময় অবদানের কথা নূতনভাবে স্মরণ করে দেয়। নিপীড়িত নির্যাতিত ও শোষিত জাতি ও সর্বহারা মানুষের মুক্তিকল্পে শহীদদের এই আত্মোৎসর্গ সুমহান ও সবচেয়ে গৌরবের। তাই তারা আজ জুম্ম জাতির প্রাতঃস্মরণীয় ও বিশ্বের মুক্তিকামী জাতি ও মানুষের কাছে সংগ্রামী প্রেরণার উৎসস্থল। আবার এই দিনটি আত্মত্যাগী মহান শহীদদের গরিমাদীপ্ত আত্মাহুতির বিপরীতে স্মরণ করে দেয় চার কুচক্রীদের জঘন্যতম ষড়যন্ত্র, উন্মত্ততা ও হিংস্রতাকে। চার কুচক্রীরা দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের যোগসাজশে নিজেদের চরম দুর্নীতি, ব্যাভিচার ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ ও পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে এই বিষাদময় ও কলংকিত দিনটির জন্ম দিয়েছিল। তারা দ্রুত নিষ্পত্তির গালভরা আশ্বাস দিয়ে জুম্ম জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল এবং আপন নেতা ও সহযোদ্ধাদের সাথে করেছিল চরম বিশ্বাসঘাতকতা। তারা আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে ইতিহাসের দুর্গন্ধময় আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হলেও কিন্তু তাদের প্রেতাত্মার লোলুপতা একনও নিশ্চিহ্ন হয়নি। দেশে-বিদেশে এই চার কুচক্রীদের প্রেতাত্মার অপচ্ছায়া আজও বিদ্যমান।

দীর্ঘ তিন বছরের অধিক যুদ্ধবিরতি বলবৎ থাকলেও এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে পার্টি ও সরকারের মধ্যে এযাবৎ ত্রয়োদশ বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি হতে পারেনি বরঞ্চ পরিস্থিতি উত্তরোত্তর জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। কেননা স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক সরকার একদিকে শান্তি প্রক্রিয়ার দোহাই দিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তকরণের হীন কার্যক্রম যেমন - ক্যাম্প সম্প্রসারণ ও সেনা সন্ত্রাস, বে-আইনি অনুপ্রবেশকরণ ও অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা ভূমি বেদখল, জুম্ম জনগণকে নানাভাবে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদকরণ, হত্যা, ধর্ষণ, গ্রেপ্তার, লুন্ঠন, মারপিট ইত্যাদি অব্যাহত রেখেছে। আর অন্যদিকে সরকার শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে জনসংহতি সমিতির সাথে অর্থহীন সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে পার্বত্য গণপরিষদ, পার্বত্য মানবাধিকার কমিশন, গণপ্রতিরোধ কমিটি, সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি, চাকমা উন্নয়ন সংস্থা, ত্রিপুরা উন্নয়ন সংস্থা, মারমা কল্যাণ সমিতি ইত্যাদি রং-বেরঙের প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে তুলে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক বীজ বপন করে জুম্ম জনগণের ঐক্যকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। এছাড়া গণধিকৃত সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর আখড়া পার্বত্য জেলা পরিষদকে ভেঙ্গে না দিয়ে বরঞ্চ পরিষদের মেয়াদ বর্ধিত করে এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জন সংহতি সমিতির সাথে দর কষাকষি করার হীন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে চলেছে।

এটা আজ অত্যন্ত বাস্তব যে, খালেদা জিয়া সরকারের বিগত পাঁচ বৎসরের শাসনামলে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তকরণের ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি। এ কারণে জুম্ম নিপীড়ন ও উচ্ছেদ নীতির কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। আর ভবিষ্যতেও এই নীতির তেমন কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনাও নেই। তাই অধিকারহারা নির্যাতিত ও শোষিত জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার রক্ষায় একমাত্র পথই হচ্ছে আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। জনসংহতি সমিতি এই কঠিন বাস্তবতার আলোকে সুদীর্ঘ দুই দশকের অধিক দিন ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবেই। বলা বাহুল্য যে, এই সুদীর্ঘ সংগ্রামে যে সমস্ত বীর জুম্ম যোদ্ধা শহীদ হয়েছেন তাদের চরম আত্মত্যাগের আদর্শই অনাগত দিনের জুম্ম জনগণকে আন্দোলন এগিয়ে নিতে অনুপ্রাণিত করবে।

জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার সংরক্ষণ ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করার পাশাপাশি জুম্ম সমাজ থেকে কুচক্রী, সুবিধাবাদী, আপোষকামী, প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন ও মূলোচ্ছেদের কার্যক্রম তীব্রতর করে তুলতে হবে। জুম্ম সমাজ থেকে সকল রকমের সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের বৃহত্তর জুম্ম জাতির ঐক্য সুদৃঢ় করতে হবে। বিশেষতঃ পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের সকল প্রকারের ষড়যন্ত্রকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সকল ফ্রন্টে জোরদার করে তুলতে হবে। আর এই সবকিছুই হোক আমাদের এবারের --১০ ই নভেম্বর, ১৯৯৫ এর সংগ্রামী অঙ্গীকার।

এম এন লারমার সংসদীয় জীবন ও চিন্তা

● শ্রী উদয়ন

জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ,মহান দেশপ্রেমিক,নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু ও জুম্ম জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা) আজীবন সংগ্রামী ছিলেন। তিনি পশ্চাদপদ ও ঘুঁনেধরা সামন্ততান্ত্রিক জুম্ম সমাজের এমন একটি পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন যে পরিবার সর্বপ্রথমেই প্রগতিবিরোধী,রক্ষণশীল ও পরনির্ভরশীল জুম্ম জাতীয় নেতৃত্ব সামন্ত নেতৃত্বের বিরোধিতা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামের অবতারণা ও জুম্ম সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন ও প্রসারের আন্দোলন শুরু করেছিলো। তাই পারিবারিক সূত্রে এম এন লারমার জীবন বাল্যকাল থেকেই সংগ্রামী চেতনায় ও বিপ্লবী আদর্শে প্রভাবিত ছিল। প্রবাদ পুরুষ ও মহান শিক্ষাবিদ পিতৃব্য কৃষ্ণ কিশোর চাকমার আদর্শ চরিত্র,মহান শিক্ষাগুরু ও সংগ্রামী পথ প্রদর্শক পিতা চিত্ত কিশোর চাকমার বিপ্লবী চরিত্র এবং স্নেহশীলা,নিবেদিতা প্রাণা ও দেশপ্রেমিকা মা'য়ের উদার চরিত্র,সর্বোপরি সামন্ত নেতৃত্বের নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার পিতামহের প্রতিবাদী ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট চরিত্র তাঁর বিপ্লবী জীবনকে রূপায়িত ও উজ্জীবিত করেছিল। এজন্যে এম এন লারমার চিন্তা-চেতনা য় একদিকে যেমনি নিখাদ জুম্ম জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম বিকশিত হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অপরাপর অঞ্চলের নিপীড়িত ও শোষিত জাতি ও সর্বহারা মানুষের প্রতি প্রেম, মমতা ও দায়িত্ববোধ গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল। স্বদেশের প্রতি গভীর প্রেম,নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের প্রতি মমতা,দায়িত্ব সম্পাদনে সততা,কর্তব্য পালনে অসীম সাহস ও দৃঢ়তা,শোষন অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ,সহযোদ্ধাদের প্রতি সহমর্মিতা,দুস্থ ও আর্তমানবতার প্রতি দয়া ও ভালবাসা সর্বোপরি নীতি-আদর্শে অটল আত্মবিশ্বাস তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল। অথচ যুগে যুগে শাসক -শোষকগোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা মহান নেতা এম এন লারমাকে গোয়েবলীয় স্টাইলে গোড়া থেকেই বারবার এই ব্যর্থ অপপ্রচার চালিয়ে আসছে যে-- তিনি ছিলেন একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী,বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু ইহা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে - শাসক-শোষক গোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের উপরোক্ত বক্তব্য নিছক অপবাদ ও অপপ্রচার ছাড়া বৈ কিছু ছিল না। এম এন লারমা তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রামের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করে গেছেন যে- তিনি শুধু জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের তথা বিশ্বের নিপীড়িত ,নির্যাতিত,অধিকার হারা জাতি ও সর্বহারা মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু ও বলিষ্ঠ নেতা। তাই তিনি কেবল বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জন্য আজীবন আন্দোলন করেননি, বস্তুতঃ বাংলাদেশের নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি বিশ্বের পরাধীন মুক্তিকামী জাতি ও সর্বহারা মানুষের অধিকারের পক্ষেও সারা জীবন লড়াই করে গেছেন। বস্তুত এ দেশের স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাসে এম এন লারমার নাম ও অবদান চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

তিনি উপনিবেশিক ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের অভিশপ্ত জোঁয়াল থেকে জুম্ম জাতিকে রক্ষা করা সহ বাংলাদেশের আপামর জনগণের মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত পঙ্গু দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার মহান সংগ্রামে পঞ্চাশ দেশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত গণ পরিষদ এবং তৎপরবর্তী জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এম এন লারমার প্রদত্ত ভাষণ সমূহ পর্যালোচনা করলেই তাঁর বিপ্লবী জীবন ও চিন্তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ১৯৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর আসনে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এম এন লারমা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হন এবং পরবর্তী ১৯৭৩ সালে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও জনসংহতি সমিতির পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিলেন। ইহা অত্যন্ত প্রনিধাণযোগ্য যে যদিও এম এন লারমার সংসদীয় জীবন মাত্র অর্ধ যুগের তা স্বত্ত্বেও এই সংক্ষিপ্ত সংসদীয় জীবনে তিনি সাংসদ হিসাবে যে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বাগ্মীতা,প্রশাসনিক দক্ষতা,দেশপ্রেম,আইনের শাসন,সততা,নির্ভীকতা ও রাজনৈতিক নীতি আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন তা বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে ও জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রথম কাজ ছিল একটি আদর্শ সংবিধান রচনা করা -- যে সংবিধান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং সকল প্রকারের জাতিগত ও শ্রেণীগত নিপীড়ন ,শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটাবে। আর এই মহান কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তালো সত্তর সালের নির্বাচনে নির্বাচিত তৎকালীন জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদের উপর। তৎকালীন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হলো। জুম্ম জনগণসহ বাংলাদেশের

আপামর জনগণের বুকভরা আশা ছিল সংবিধানে জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং উপনিবেশিক অপশাসনের সকল কালাকানুন ও দমনপীড়নের চির অবসান হবে।

কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে বাংলাদেশের নব্য শাসকগোষ্ঠী ইতিহাস থেকে সেই শিক্ষা নিতে পারেনি। পারেনি উত্তাল গণআন্দোলনের যুগে প্রতিশ্রুত মহান ঘোষণার কথা স্মরণে রাখতে। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর গণ পরিষদে বিল আকারে উপস্থাপিত হলো। দেখা গেল খসড়া সংবিধানে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, মাঝিমাল্লা, কামার, কুমার, তাঁতী,জেলে,চির নির্যাতিতা নারী প্রভৃতি খেটে খাওয়া ভাগ্যবিড়ম্বিত সর্বহারা জনগোষ্ঠীর অধিকার সংবিধানে লেখা হয়নি। সর্বোপরি যুগ যুগ ধরে পৃথক শাসনে শাসিত এবং চিরলাঞ্চিত ,বঞ্চিত ও শোষিত জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকারও সংবিধানে কণামাত্র ঠাঁই দেয়া হয়নি। উপরন্তু স্বতন্ত্র জাতি স্বত্ত্বার অধিকারী জুম্ম জনগণকে বাঙ্গালী জাতিতে পরিণত করার সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থা পাকাপোক্তভাবে প্রণীত হলো যদিও গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে সংবিধানে গৃহীত হয়েছিল। অতএব মহান নেতা ও তৎকালীন গণ পরিষদের একমাত্র নির্দলীয় সদস্য এম এন লারমা তাঁর ঐতিহাসিক সংগ্রামী দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। পৃথক শাসনের অধিকারী জুম্ম জাতি সহ নিষিদ্ধ পল্লীতে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিতা মহিলা ও বাংলাদেশের কৃষক,শ্রমিক, মাঝিমাল্লা, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতী প্রভৃতি মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য তিনি গণ পরিষদে আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। খসড়া সংবিধানের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাহাত্তরের ২৫ শে অক্টোবর গণপরিষদের অধিবেশনে বলেনঃ

"মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের দেশের জন্য যে সংবিধান আমরা রচনা করতে যাচ্ছি, আপনার মাধ্যমে আজকে এই মহান গণপরিষদে দাঁড়িয়ে সেই সংবিধানের উপর আমি কিছু আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে। আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যারা কারাগারে তিল তিল করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল,যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসককে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাসিমুখে হাতকড়া পরেছিলেন, হসিমুখে ফাঁসি কাষ্ঠকে বরণ করেছিলেন,তাদেরকে।

১৯৪৭ সালের পর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এই দেশ থেকে চলে যাওয়ার পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্য যে কৃত্রিম স্বাধীনতা হয়েছিল ,সেই কৃত্রিম স্বাধীনতার পর থেকে যে সব বীর ,যে সব দেশপ্রেমিক নিজের জীবন তিলে তিলে চারদেওয়ালের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে উৎসর্গ করেছিলেন স্বাধীকার আদায়ের জন্য, যাঁরা নিজেদের জীরন উপেক্ষা করে স্বাধীকার আদায়ের পথে গিয়েছিলেন, তাঁদের কথা আজকে আমি স্মরণ করছি তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আজকে এখানে যাঁরা সমবেত হয়েছেন, যে মাননীয় সদস্য-সদস্যাবৃন্দ রয়েছেন,তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তারপর,আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি গত এপ্রিল মাসে যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল ,সেই কমিটির সদস্য বন্ধুদের। সর্বশেষে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমাদের শ্রদ্ধেয় জননেতা, জাতির পিতা,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আজকে আমরা এই গণপরিষদ ভবনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছি। এই ইতিহাসের পেছনে রয়েছে কত করুণ কাহিনী,কত মানুষের অঝোর ধারায় কান্নার কাহিনী, বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের করুণ আর্তনাদ। তাই আজকে আমরা সেসব মানুষের কথা স্মরণ করে যদি বিবেকের প্রতি এতটুকু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগিয়ে যাই,তাহলে এই কথাই আমরা বলবো,আজকে এখানে দাঁড়িয়ে যে পবিত্র শপথ আমরা নিয়েছি,সেই পবিত্র শপথ নিয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য যে পবিত্র দলিল আমরা দিতে যাচ্ছি,সেই পবিত্র দলিলে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে কিনা, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা অর্থাৎ তারা যে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায়, সে কথা এই সংবিধানে ব্যক্ত হয়েছে কিনা।

তাই মাননীয় স্পীকার সাহেব,আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে যে কথা তুলতে যাচ্ছি,তাতে যদি কোন ভুলত্রুটি থাকে,তাহলে আমি তা শুধরে নিতে চাই কিন্তু আমি মনে করি ,আমি আমার বিবেক থেকেই এসব কথা বলছি। আমি কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কিছুই বলতে যাচ্ছি না। যেহেতু আমি একজন নির্দলীয় সদস্য,যেহেতু আমি এই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষেরই একজন হয়ে আজকে গণপরিষদ ভবনে আমার মতামত প্রকাশ করতে যাচ্ছি, সাড়ে সাত কোটি মানুষের নিকট প্রকাশ করতে যাচ্ছি,তাই সংবিধানের উপর আমার কোন চুলচেরা ব্যাখ্যা নেই। আমার যে ব্যাখ্যা,আমার যে মত, আমার যে বক্তব্য,তার সবই দেশের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। যেভাবে আমার দেশকে ভালবেসেছি, আমার জন্মভূমিকে ভালোবেসেছি , যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আমার দেশকে,আমার জন্মভূমিকে,এদেশের কোটি কোটি মানুষকে দেখেছি,সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আমি খসড়া সংবিধানকে দেখতে যাচ্ছি। .....

তাই আমি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য বন্ধুদের বলছি যে, খসড়া সংবিধান তারা গত জুন মাসে দিতে পারেননি যদিও গত জুন মাসের ১০ তারিখে দেওয়ার কথা ছিল। আজকে এই অক্টোবর মাসে আমাদের এই খসড়া সংবিধান তারা দিয়েছেন। এই খসড়া সংবিধান আমরা জুন মাসে পাইনি,সেজন্য দুঃখিত নই। অক্টোবর আর জুন মাসের

মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েকটি মাসের। সেজন্য আমার ব্যক্তিগত অভিমত,আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এখানে আমার আপত্তি হচ্ছে এই যে, যে কমিটিকে আমরা এ দেশের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের ভার দিয়েছিলাম,সেই কমিটি-প্রদত্ত সংবিধান আজকে আমাদের হুবহু গ্রহণ করতে হচ্ছে।

এই পরিষদের সামনে আমার বক্তব্য হল, আজকে খসড়া সংবিধান যদি এই এই গণপরিষদ- এ এইভাবে গৃহীত হয় , তাহলে সে ক্ষেত্রে আমার যে আপত্তি আছে সে আপত্তি হল, আমার বিবেক,আমার মনের অভিব্যাক্তি বলছে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে নাই। যদি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই খসড়া সংবিধানে থাকত,তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকত না। কিন্তু আজ আমি দেখতে পাচ্ছি,পদ্মা,মেঘনা, ধলেশ্বরী,বুড়িগঙ্গা,মাথাভাঙ্গা,শঙ্খ,মাতামহুরী, কর্ণফুলী,যমুনা,কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন , মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে,দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে,মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন,তাঁদেরই মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। আমি বলছি,আজকে যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন,তাদের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি।

আজকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আপনারা বাংলাদেশের মেহনতী মানুষের কথা সমাজতন্ত্রের নামে, গণতন্ত্রের নামে বলে চলেছেন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ সংসদীয় অভিজ্ঞতা আমার সে রকম নাই। তবু আমার বিবেক বলছে এই সংবিধানের কোথায় যেন গলদ রয়েছে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে যারা কল-কারখানায় চাকা, রেলের চাকা ঘুরাচ্ছেন,যাঁদের রক্ত চুইয়ে আজকে আমাদের কাপড়,কাগজ প্রতিটি জিনিষ তৈরী হচ্ছে, সেই লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের মনের কথা এখানে নাই।

তারপর আমি বলব, সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনেদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়,তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ,তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ। .....আজ পল্লীর আনাচে -কানাচে আমাদের যে সমস্ত মা-বোনেকে তাদের দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, তাদের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি। এই সংবিধানে সেই মা-বোনেদের জীবনের কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি। যদি এটা আদর্শ সংবিধান হতো,যদি এটা গণতান্ত্রিক ,সমাজতান্ত্রিক সংবিধান হতো,তাহলে আজকে যারা নিষিদ্ধ পল্লীতে নিজেদের দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে,তাদের কথা লেখা হত, তাদেরকে এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে আনার কথা থাকত, কিন্তু তাদের মনের অভিব্যাক্তি প্রকাশের কথা,খেয়ে - পরে বেঁচে থাকার কথা এই সংবিধানে নাই।

এই সংবিধানের মানুষের অধিকার যদি খর্ব হয়ে থাকে,তাহলে আজকে ৩০ লক্ষ শহীদের কথা স্মরণ করে অতীতের ইতিহাস স্মরণ আমি বলব যে, ইতিহাস কাউকে কোনদিন ক্ষমা করেনি,করবেও না - - ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর। আমরা দেখেছি ১৯৫৬ সালের সংবিধান যে সংবিধানকে আয়ুব খানের মত একজন সৈনিক লাথি মেরে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে পাকিস্তানের বুকে স্বৈরাচারী সরকার গঠন করেছিল। তারপর ১৯৬২ সালে তার মনের মত একটি সংবিধান রচনা করে সেটাকে দেশের বুকে চাপিয়ে দিয়ে ভেবেছিল যে, তার এই সংবিধান এদেশের মানুষ গ্রহণ করবে। কিন্তু এ দেশের মানুষ সেটা গ্রহণ করেনি।

এই সংবিধানও যদি সে ধরণের হয়ে যায়, তাহলে ইতিহাস কি আমাদের ক্ষমা করবে? তাই ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মত,১৯৬২ সালের সংবিধানের মত এই সংবিধানকেও কি আমরা হতে দিব,আমার বিবেক বলছে, আমরা এমন সংবিধান চাই না। আমরা এমন সংবিধান চাই, যে সংবিধান আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটা পবিত্র দলিল হয়ে থাকবে। সেরকম সংবিধানই আমরা চাই। আমার যা মনের কথা তা আমি ব্যক্ত করলাম। মাননীয় স্পীকার সাহেব,আজকে যে পবিত্র দলিল আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি,সেটা যেন ১৯৫৬ সালের এবং ১৯৬২ সালের দলিলের মত না হয় এবং সেদিনের মতো করুণ অবস্থা যেন আমাদের জীবদ্দশায় দেখে যেতে না হয়।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে মানুষের মনে যে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে,আমরা যদি সেই সন্দেহের অবসান না করি,পরিষদে আমরা যদি তার নিরসন না করি, তাহলে আর কে করবে? আমাদের পর যাঁরা আসবেন, তাদের সেই একই করুণ অবস্থা হবে — যেমন হয়েছে পূর্ববর্তীদের। সেই করুণ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটুক,আমরা তা চাই না। .....

সংবিধানে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মনের কথা যদি সত্যিকারভাবে লিপিবদ্ধ হত,তাহলে আজকে নিদর্লীয় সদস্য হিসাবে এই সংবিধানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে পারতাম। অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে না পারার অনেক কারণের মধ্যে এক কারণ হল, এখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলি পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

মাননীয় স্পীকার, এই দলিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, এক হাতে অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং অন্য হাতে সেটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার সাহেব,সংবিধানের ১০ নং অনুচ্ছেদ এবং ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ

১০। মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

এবং

২০। কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার,কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী' – এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

মাননীয় স্পীকার , আজকে এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি, একদিকে হিংসাদ্বেষ-বিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আর অন্যদিকে উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন-ব্যবস্থাসমূহের মালিকানা,রাষ্ট্রীয় মালিকানা,সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে শোষণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এমন একটা ক্ষমতা দেখতে পাচ্ছি, যে ক্ষমতা বলে সরকার একটা লোককে এক পয়সার অধিকারী হতে দেবেন এবং অন্য একটা লোকের জন্য এক কোটি টাকার মালিকানার অধিকার রেখে দেবেন।

মাননীয় স্পীকার,তাই এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা,প্রাণের কথা এখানে প্রতিফলিত হয়নি বলে আমি মনে করি। কৃষকের কথা প্রতিফলিত হয়নি,শ্রমিকের কথা প্রতিফলিত হয়নি,রিক্সাওয়ালার কথা প্রতিফলিত হয়নি ,মেথরের কথা প্রতিফলিত হয়নি। আজ এদের সবার জীবন, মেথরের জীবন,খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন অভিশপ্ত। তাদের কথা,তাদের দাবী এখানে স্থান পায়নি। এই যে অভিশপ্ত জীবন তাদের কথা সংবিধানে নাই।

তারা যদি আজ জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা দেশের ভাগ্য নির্ধরিণ করতে যাচ্ছ – তোমরা তাতে আমাদের কথা কি কিছু লিখেছ?" এই প্রশ্নের আমরা কি উত্তর দেব? যে মেথররা দেশকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে,আজ আমরা শীতত্তাপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে তাদেরকে কি আশ্বাসের বাণী শোনাচ্ছি? তাদের অভিশপ্ত জীবনকে সুখী করে তোলার মতো কতটুকু আমরা দিয়েছি,এই সংবিধানে কি প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি? কিছুই না।

আমাকে আজ বলতে হচ্ছে,বাংলাদেশের যারা সত্যিকারের শোষিত, নিপীড়িত,তাদের কথা এই সংবিধানে নাই। হ্যাঁ,তাদের কথা এই সংবিধানে আছে,যারা শোষিত নয়,নির্যাতিত নয়, নিপীড়িত নয়। মাননীয় স্পীকার , তাই আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে,প্রশ্ন করতে হচ্ছে যে, এটা কাদের সংবিধান? যদি জনগণের সংবিধান না হয়,তাহলে আমরা দেশকে কেমন করে গড়ে তুলব,দেশের মানুষকে কেমন করে ভবিষ্যতে সুখী জীবনের নির্ভরতা দান করব?

এরপর,বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার কথা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি-সত্ত্বার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা উচিৎ নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই।

আমি খুলে বলছি। বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি, সে কথা আমি না বলে পারছি না। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী । আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এই সংবিধানে নাই। যুগে যুগে বৃটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সবসময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল ,অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কিভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা — পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এটা আমার কাছে বিস্ময়। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় এলাকা। এই এলাকার সেইসব ইতিহাসের কথা,আইনের কথা এই সংবিধানে কোথাও কিছু নাই।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই মহান পরিষদে দাঁড়িয়ে আজকে আমি আপনার মাধ্যমে একজন সরল মানুষের অভিব্যাক্তি প্রকাশ করছি। আমাদের এলাকাটা একটা উপজাতি এলাকা। এখানে বিভিন্ন জাতি বাস করে। এখানে চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই,বোম,পাংখো,খুমি,মুরুং এবং চাক এইরূপ ছোট ছোট দশটি উপজাতি বাস করে। এই মানুষের কথা আমি বলতে চাই।

এই উপজাতি মানুষদের কথা বৃটিশ পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছিল। পাকিস্তানের মত স্বৈরাচারী গভর্ণমেন্ট আমাদের অধিকার ১৯৫৬ সালের এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে স্বীকার করে নিয়েছিল। জানি না ,আজকে যেখানে গণতন্ত্র হতে যাচ্ছে,সমাজতন্ত্র হতে যাচ্ছে,সেখানে কেন আপনারা আমাদের কথা ভুলে যাচ্ছেন?

পৃথিবীর অনেক দেশেই সমাজতন্ত্র হয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নেও উপজাতিদের অধিকার আছে। পৃথিবীর আর একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত –আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র – আমরা সেখানে দেখি,তাদের সংবিধানে বিভিন্ন জাতিকে অধিকার দেওয়া হয়েছে জানি না, আমরা কি অপরাধ করেছি?

আমি যতদূর বুঝতে পারি,আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি, আমি একজন মানুষ। এমন একজন মানুষ, যারা যুগ যুগ ধরে অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেই জাতির প্রতিনিধি আমি। আমার বুকের ভিতর কি জ্বালা,তা আমি বুঝাতে পারব না। সেই জ্বালা আর কারোর ভিতর নাই। সেই জ্বালার কথা কেউই চিন্তা করেননি।

মাননীয় স্পীকার সাহেব,১৯৪৭ সালে কেউ কি চিন্তা করেছিলেন যে,পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে? জনাব মোঃ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন,"**pakistan has come to stay**".নিয়তি অদৃষ্ট থেকে সেদিন নিশ্চয় উপহাস ভরে হেসেছিলেন।সেই পাকিস্তান অধিকার হারা বঞ্চিত মানুষের বুকের জ্বালায়, উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

আমি আমার অভিব্যাক্তি প্রকাশ করছি। আমি একজন নির্যাতিত অধিকার হারা মানুষ। পাকিস্তানের সময় দীর্ঘ ২৪ বছর পর্যন্ত একটি কথাও আমরা বলতে পারিনি। আমাদের অধিকারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই অধিকার আমরা পেতে চাই এবং এই চাওয়া অন্যায় নয়। সেই অধিকার এই সংবিধানের মাধ্যমে দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মত যাতে সেই অধিকার আমরা ও পেতে পারি, সেই কথাই আজকে আপনার মাধ্যমে পরিষদের নিকট নিবেদন করতে চাচ্ছি।

সেই অধিকারের কথাই আমি বলতে চাচ্ছি। মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের হয়নি — যেমন দেওয়া হয়নি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষকে।

তাই আমি আমার কথা যদি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্য-সদস্যাদের,ভাই-বোনদের কাছে পৌছিয়ে দিতে পারি ,তাহলে আমি মনে করব, আমার অভিব্যাক্তি সার্থক হয়েছে। কারণ, আমার যে দাবী সেই দাবী আজকের নয়। এই দাবী করেছি স্বৈরাচারী আয়ুব ও স্বৈরাচারী ইয়াহিয়ার সময়ও। আমরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে পেছনে পড়ে রয়েছি। অগ্রসর জাতির মত শক্তিশালী দল গঠন করে দাবী আদায় করতে পারছি না। কারণ এতে যতটা রাজনৈতিক সচেতনতার দরকার,ততটা রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব রয়েছে উপজাতিদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে তাই কথা প্রসঙ্গে এইকথা বলতে চাচ্ছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বদৌলতেই আজকে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জল বিদ্যুতের বদৌলতে কলকারখানা চলছে। অথচ সেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে শোষণ করা হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে,যারা দেশকে গড়েছে,পাকিস্তানের শাসকরা তাদের মানুষের মতো বাঁচার অধিকার দেয়নি। আমার বক্তব্য হল, আজকে আমরা এই সংবিধানে কিছুই পাইনি। আমি আমার বক্তব্য হয়তো সঠিকভাবে বলতে পারছি না, কিন্তু আমার বক্তব্যের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক কিছুই নাই।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে আমাদের জাতির পিতা শ্রদ্ধেয় বঙ্গবন্ধুর কাছে যুক্তি স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। এই স্মারকলিপিতেপার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনের কথা বলেছিলাম, আমাদের উপজাতিদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্ব-শাসনের কথা বলেছিলাম।

এই সংবিধানে আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা বঞ্চিত মানব। আমাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে। এই সংবিধানের বহিরের কথা আমি বলতে চাচ্ছি না।আমার পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা সং বিধানে বলা হয়নি। এইজন্য এই কথা বলছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা ইতিহাস। এই ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়েছে। আমি জানি না,আমাদের কথা তারা কেমন করে ভুলে গেলেন? আমরাও যে বাংলাদেশের সঙ্গে এক হয়ে গণবাংলার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকতে চাই, সে কথা তারা কি ভুলে গেছেন?

আমাদের এই সংবিধানের খসড়া তৈরী করার সময় তারা অন্যান্য দেশের সংবিধান দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন বাংলাদেশের ইতিহাস। তাঁরা দেখেছেন বাংলাদেশের এক কোণায় রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। কিন্তু কিসের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসকে এখানে স্থান দেওয়া হয়নি?

আমরা জানি, ইতিহাসকে বিকৃত করা যায় না। কিন্তু আমরা কি দোষ করেছি? কেন আমরা অভিশপ্ত জীবনযাপন করবো? পাকিস্তানের সময়ে ছিল আমাদের অভিশপ্ত জীবন। আজকে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র হতে চলেছে। আমাদের অধিকার তুলে ধরতে হবে এই সংবিধানে। কিন্তু তুলে ধরা হয়নি। যদি আমাদের কথা ভুলে যেতে চান, যদি ইতিহাসের কথা ভুলে যেতে চান,তাহলে তা আপনারা পারেন। কিন্তু আমি পারি না। উপজাতিরা কি চায়? তারা চায় স্বাধীন গণপরিষদের অধিবেশনে তাদের সত্যিকারের অধিকারের নিশ্চয়তা।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব,তাই আজকে বঞ্চিত মানুষের মনের কথা আমি আপনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। সেই বঞ্চিত মানুষের একজন হয়ে আমি বলতে চাচ্ছি,আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা নির্যাতিত সেই বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে, সেই পাকিস্তান আমলের যে নির্যাতন ভোগ করেছি সেই নির্যাতন থেকে রেহাই পেতে চাই। আমরা চাই মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচে থাকতে।

এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আমাদেরকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করেছেন। এই খসড়া সংবিধানে আমাদের অবহেলিত অঞ্চলের কোন কথা নাই। তাই আজকে আমি বলতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে কি অপরাধ করেছে,তা আমি জানি না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে,পিছিয়ে পড়া নির্যাতিত জাতিকে,অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করবে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না। .....

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে কেন এই সংবিধানে সংযোজিত করা হল না? যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তাহলে এই সংবিধান তাদের কি কাজে লাগবে। আমি একজন মানুষ যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি , যে জন্মভূমিতে আজন্ম লালিত পালিত হয়েছি, সেই জন্মভূমির জন্য আমার যে কথা বলার রয়েছে, সে কথা যদি প্রকাশ করতে না পারি ,যদি এই সংবিধানে তার কোন ব্যবস্থাই দেখতে পাই না,তাহলে আমাকে বলতে হবে যে,বঞ্চিত মানুষের জন্য সংবিধানে কিছুই রাখা হয়নি। বঞ্চিত মানুষের সংবিধান এটা কিছুতেই হবে না এবং মানুষ এটাকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে।

তাই আমার কথা শেষ করার আগে আমার কথাগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে চাই, এই সংবিধানে মানুষের মনের কথা লেখা হয়নি। কৃষক, শ্রমিক, মেথর, কামার, কুমার,মাঝিমাল্লার জন্য কোন অধিকার রাখা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের অধিকারের কথাও সংবিধানে লেখা হয়নি।"

গণপরিষদে খসড়া সংবিধানকে দফাওয়ারী বিবেচনা কালে ৩১ অক্টোবর,১৯৭২ ইং আওয়ামী লীগের সদস্য আবদুর রাজ্জাক ভুঁইয়া সংবিধান বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো – "৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙ্গালী বলিয়া

পরিচিত হইবেন।" আওয়ামী লীগের নিরংকুশ সংখ্যগরিষ্ঠতার জোরে সেদিন ঐ সংশোধনী প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। এই সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে বাঙালী জাতি থেকে সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সত্বার অধিকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের দশভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণ সহ বাংলাদেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্বাসমূহকে বাঙালী জাতিতে রূপান্তরিত করার হীন ষড়যন্ত্রের সাংবিধানিক রূপ লাভ করে। এম এন লারমা এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং প্রতিবাদস্বরূপ অনির্দৃষ্ট কালের জন্য গণপরিষদের অধিবেশন বর্জন করলেন। সেদিন তিনি উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এভাবে —

"মাননীয় স্পীকার সাহেব জনাব আবদুর রাজ্জাক ভূইয়া সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন যে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলে পরিচিত হবেন।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল, সংবিধান বিলে আছে,"বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।" এর সঙ্গে সুস্পষ্ট করে বাংলাদেশের নাগরিকগণকে 'বাঙালী' বলে পরিচিত করবার জন্য জনাব আবদুর রাজ্জাক ভূঁইয়ার প্রস্তাবে আমার একটু আপত্তি আছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা,তাতে করে ভালভাবে বিবেচনা করে তা যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি।

আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি,সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশে বাংলাভাষায় বাঙালীদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শেখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতঃপ্রতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণরে সঙ্গে আমরা ওতঃপ্রতভাবে জড়িত। সবদিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে এক যোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ – কেউ বলেন নাই,আমি বাঙালী।

আমার সদস্য-সদস্যা ভাই-বোনদের কাছে আমার আবেদন,আমি জানি না , আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙালী বলে পরিচিত করতে চায়।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদিগকে বাঙালী জাতি বলে কখনো বলা হয় নাই আমরা কোনদিনইনিজেদের বাঙালী বলে মনে করি নাই। আজ যাদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাশ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালী বলে নয়। .....

মাননীয় স্পীকার, আমাদের অধিকার সম্পর্ণরূপে খর্ব করে এই ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধিত আকারে গৃহীত হল। আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ স্বরূপ আমি অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য গণপরিষদ বৈঠক বর্জন করছি।"

প্রসঙ্গত ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, –সংবিধান বিল বিবেচনাকালে এম এন লারমা চৌদ্দটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তম্মধ্যে ৪৭ক অনুচ্ছেদ নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের স্বায়ত্বশাসনের ধারা সংযোজনী প্রস্তাব ব্যাতীত অবশিষ্ট সবক'টি প্রস্তাব বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার ও সমগ্র দেশের সার্বিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক ছিল। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগের নব্য শাসকগোষ্ঠীর নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্টতায় পরিপূর্ণ গণপরিষদে তাঁর কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি। গোটা সংবিধানটি ৬৫ টি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে গৃহীত হলেও তম্মধ্যে বিরোধী দলের (ন্যাশানেল আওয়ামী পার্টি) একমাত্র সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের একটি সংশোধনী ব্যতীত অবশিষ্ট ৬৪ টি সংশোধনী ক্ষমতাসীন দলের। কাজেই এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, — তৎসময়ে গৃহীত সংবিধান দেশের সামগ্রিক স্বার্থের চাইতে আওয়ামী নব্য শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থই সেখানে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছিল। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৯৭৩ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও সাথোয়াই রোয়াজা যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের সংসদীয় আসনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর এম এন লারমা সংসদের ভেতরে ও বাইরে সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র এই চারটি মূলনীতি স্বীকৃত হয়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করা হলেও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে ও জাতীয় সংসদের অধিবেশনের অপরাপর ধর্মকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হতে থাকে। জাতীয় সংসদের অধিবেশনের শুরুতে কেবল মাত্র কোরাণ তেলওয়াত ও গীতা পাঠ করা হয়ে থাকে। অতএব এম এন লারমা এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিনি ৭ ই এপ্রিল, ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তুলে ধরলেন যে -

"মাননীয় স্পীকার, শপথগ্রহণের আগে আমাদের দিনের কর্মসূচী যখন আরম্ভ হয়েছে ,তখন পবিত্র কোরাণ থেকে 'সুরা' পাঠ, এবং গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করা হয়েছে। এখন আপনার মাধ্যমে এই পরিষদের নিকট আমার বক্তব্য হচ্ছে যে,এই পরিষদে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক প্রতিনিধিত্ব করছি। বাংলাদেশের শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী বা শুধু ইসলাম-ধর্মাবলম্বী লোক নাই — বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকও আছেন। মাননীয় স্পীকার,এখন আমার প্রশ্ন হল যে, কেবল পবিত্র কোরণ পাঠ এবং গীতা পাঠ করা হবে,না বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের ত্রিপিটক এবং খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বাইবেল থেকেও পাঠের প্রয়োজন

আছে?....."

এম এন লারমার দাবীর প্রেক্ষিতে যদিও বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হবে বলে সেদিন আইনমন্ত্রীপূর্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তৎপরবর্তী আরো বেশ কয়েকবার এ বিষয়ে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে তবেই ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ করা হয়। এভাবেই জাতীয় সংসদে এম এন লারমার প্রথম বিজয় সূচিত হলো এবং এতে খ্রীস্টান ধর্মীয় মহল থেকে এম এন লারমাকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানানো হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান হলো প্রধান ফসল। কাজেই কৃষি খাতের উন্নয়ন এবং দেশের খাদ্য সংস্থানের ক্ষেত্রে ধান চাষের উন্নতি ও উচ্চ ফলনশীল ধানের গবেষণা অত্যন্ত জরুরী। এলক্ষ্যে তৎকালীন সরকার জাতীয় সংসদে ৯ ই জুন, ১৯৭৩ ইং " বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট বিল, ১৯৭৩" উত্থাপন করেন। ঐ বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিধিবিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিলটিকে ১৭ ই জুন,১৯৭৩ তারিখের মধ্যে জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচার করা হোক" — এই শিরোনামে এম এন লারমা একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলেন —

" ..... **এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিল। বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক দেশ। আমাদের এ দেশ সম্পূর্ণভাবে ধান - চাউলের উপর নির্ভরশীল। যে দেশ ধান-চাউল না হলে অন্য সব কিছুর উন্নয়ন ঠিক মতো চালিয়ে যেতে পারে না, সে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য দেখতে হবে কিভাবে ধানচাষ ভালভাবে করা যায়। সেইজন্য এই ধান গবেষণা ইষ্টিটিউট করা হবে, যা শুধু একদিনের জন্য নয় — যতদিন দেশ থাকবে, ততদিন এই ইনষ্টিটিউট থাকবে। সুতরাং বিলটাকে যদি আমরা ভালভাবে যাচাই না করি, তাহলে প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান ধান গবিষণা ইষ্টিটিউট এর মাধ্যমে কুখ্যাত মোনেম সরকার যেভাবে Grow more food campaign করে অফিস থেকে শুধু বস্তা বস্তা কাগজের হিসাব পাঠাত, কিন্তু সরেজমিনে কোন কাজ হত না, সেই অবস্থার আশংকা থাকতে পারে।**

সুতরাং এটা শুধু আজকে বিরোধিতার খাতিরে নয় বা কার্যপ্রণালী - বিধির বলে ক্ষমতা পেয়ে যে বিলটি প্রচার করাতে যাচ্ছি তা নয়। এটা সম্বন্ধে জনগণের মতামত আমাদের শুনে নেওয়া উচিত। তাই আমি 'জনমত যাচাইয়ের জন্য বিলটি প্রচার করা হোক।' — এই প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করলাম।"

এম এন লারমার উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট যে, — দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রণীত পরিকল্পনা ও আইনবিধি কেবল সুরম্য অট্টালিকার চার দেওয়ালের মধ্যে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন পন্ডিতী পর্যালোচনার মাধ্যমে কোন কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি তৃণমূল পর্যায়ে আলোচনা পর্যালোচনার পর সকল স্তরের মতামতের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত আইন বিধি প্রণয়নে সবিশেষ প্রাধান্য দিতেন। এই পদ্ধতি বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে দেশে দেশে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এম এন লারমার ঐ বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব সেদিন ধ্বনি ভোটে নাকচ হয়ে যায়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েকবছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার তার প্রতিশ্রুত গণমুখী নীতি থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করে। গণমুখী নীতি থেকে সরে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের চাইতে দেশের আমলা শ্রেণী ও শাসক শ্রেণীর তোষণনীতি প্রকাশ পেতে থাকে। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানা, বীমা শিল্প, রেলওয়ে তথা দেশের অর্থনীতিকে ভেঙ্গেচুরে নিজেদের সুবিধামতো সাজাতে থাকে। " বীমা কর্পোরেশন বিল, ১৯৭৩" নামে সংসদে একটি বিল উত্থাপন করে সরকার বীমা শিল্পকে তথাকথিত ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এম এন লারমা এর তীব্র সমালোচনা করেন, এবং এই যুক্তিতে বিলটি জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব রাখেন যে, **" রাষ্ট্রায়াত্ব বীমা কোম্পানীগুলোর সম্পদ এ দেশের অর্থনীতির সাথে যুক্ত। সরকার এসব বীমা কোম্পানী উন্নতি করার জন্য যে নীতি গ্রহণ করেছেন সে নীতি যেন জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হতে পারে, জনগণ বুঝতে পারে সেইজন্য বিলটি জনমত যাচাইয়ের জন্য পাঠাতে অনুরোধ করছি।"** বলা বাহুল্য এম এন লারমার উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

রেলওয়ে বোর্ডের অবকাঠামো এবং রেলওয়ের বাজেটের উপরও তিনি ২১শে জুন, ১৯৭৩ ইং সংসদে সরকারকে সমালোচনা করেন এবং লক্ষ লক্ষ নিম্ন শ্রেণীর অবহেলিত কর্মচারীর স্বপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেনঃ —

".....আজকে সেই রেলওয়ে বোর্ডের কর্মচারীদের আরাম-আয়াসের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। অর্থচ এই বাবদে ১৯৭২-৭৩ সালে বরাদ্দ ছিল ২৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এদের জন্য আরও কিছু বেশী সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ রেলওয়ে যেসব নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে, যেমন লাইনম্যান, সিগনালম্যান, এদের কল্যাণের জন্য কিছুই করা হয়নি। সুতরাং আমাদের এ ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা করা উচিৎ। আজকে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য আমরা কোটি কোটি মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা তা ভঙ্গ করতে পারব না। আমরা দেশকে বিপদে ফেলতে পারব না। আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব উন্নতির দিকে। এখানে দেখা যায় একজন 'পয়েন্টস্‌ম্যান', একজন ট্রেনের টিকেট কালেক্টরের বেতন, আর রেলওয়ে বোর্ডের কর্মচারীদের বেতনের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। এর উপর আরও ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছি। সেগুলো হচ্ছে, (ঙ), (চ), (ছ) ও (জ)। জনাব স্পীকার সাহেব, আজকে আমাদের এটা সম্পূর্ণরূপে চিন্তা করা উচিৎ, যাঁরা পাকিস্তান আমলে, বৃটিশ আমলে সব সময় সুখে শান্তিতে আরাম আয়েসের সাথে জীবন যাপন করে এসেছিল, যাঁদের ১০-১২ কামরার বাড়ী দেওয়া হয়েছিল তাঁরা সেখানে সব সময় আরাম আয়েস করছেন এবং এখনও করছেন। আর সেই 'পয়েন্টস্‌ম্যান' দিন রাত কাজ করে তাঁরা বৃষ্টিতে ভিজে, কড়া রৌদ্রে পুড়ে কাজ করেন অথচ তাঁদের জন্য থাকার বন্দোবস্ত নেই। আজকে

সরকারী বিনিয়োগের প্রতিদান খাতে বাজেটে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই আয় কারা করবে? এই সব নিম্ন বেতনের কর্মচারীরা এ টাকা আয় করে দিচ্ছে। আজকে প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেডের কর্মচারীরা পরিশ্রম করছেন নিচের দিকের কর্মচারীরাই প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম করে যাচ্ছে। কাজেই আমি যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছি, সেটা আমি এখানে ব্যাখ্যা করলাম।"

১৯৭৩-৭৪ বাজেট সহ বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপরও আলোচনা করতে গিয়ে এম এন লারমা ২৩শে জুন ১৯৭৩ইং বাংলাদেশের অর্থনিতীর বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটকে এলিট শ্রেণীর বাজেট বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি উক্ত আলোচনায় বলেন —

"....মাননীয় স্পীকার সাহেব, বাজেটে অর্থমন্ত্রী কোন লুকোচুরী করেন নাই। তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা,খাদ্য ঘাটতি সব কিছুই খুলে বলেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে বিদেশ থেকে খাদ্য না আনলে খাদ্য-ঘাটতি পুরণ হবে না। মাননীয় স্পীকার সাহেব, যে কথাটা আমাদের মনে বাজে, সেকথাটা হলো আমাদের অভাব অপরিসীম,আমাদের সমস্যা অসংখ্য। হাজারো সমস্যার মোকাবেলা করেই আমরা দেশকে গড়ে তুলবো। সংবিধানের মাধ্যমে যে সুখী জীবন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি, সে প্রতিশ্রুতি বাজেটে সংরক্ষিত হয়েছে কিনা সেটাই বিবেচ্য বিষয়। বাজেটে একটা বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়েছে। সেখানে গলদ রয়েছে। সে গলদটা হলো যে শোষণ মুক্ত সমাজব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম সে সম্বন্ধে বাজেটে পুরোপুরি দুর্বলতা রয়েছে। মাননীয় স্পীকার সাহেব,এই দুর্বলতার কথাটা বলার সাথে সাথে একটা ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। সে ছবিটা হলো যখন কেনাকাটা করার জন্য কোন দোকানে আমরা যাই, দোকান থেকে বের হওয়ার সময় দেখা যায় কয়েকজন ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত লোক এসে বলছে," স্যার,দু'টো পয়সা"। আজ এই বাস্তব জীবনের ছবি নিয়ে যেখানে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকার হিসাব দেখানো হয়েছে , সেখানে এ সমস্ত লোকের আশা আকাঙ্খা পুরণের কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং যে ভিখারী,সেও মানুষ; আর আমি যে এখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছি, আমিও মানুষ। কিন্তু দুই মানুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এই দু'য়ের পার্থক্য ঘুচিয়ে দেবার পরিকল্পনা এই বাজেটে স্থানলাভ করেনি। সংবিধানে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই এই বাজেট শ্রেষ্ঠ সমাজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল্যায়ন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবাস্তবায়নের কথা এই বাজেটের বক্তৃতায় পরিস্কারভাবে বলেননি। ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক বাজেটে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের প্রথম পদক্ষেপ পূরণে আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন – এটা তিনি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন।

সুতরাং এই পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের সাথে সামাজিক পরিকল্পনা, আমাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য সার্বিক জীবনের আদর্শের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই দিতে হবে। সেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম বৎসর প্রথম বাজেটে সে প্রতিশ্রুতি যা সংবিধানে দেওয়া হয়েছিল - মানুষ - খেয়ে- পরে বেঁচে থাকার অধিকার পাবে – আজকের বাজেটে তা কি উল্লেখ করা হয়েছে? বিশেষ করে কৃষি,প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণমূলক যে সমস্ত বিষয় আছে, তার সম্বন্ধে কতটা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আর এ সমস্ত বিষয়ের সাথে জমি ও সম্পদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সম্পদ বন্টন যদি সত্যিকারভাবে না হয়, তাহলে সবকিছুই ব্যর্থ হবে। তাই এই বাজেটে আয় ব্যয়ের যে হিসাব শিক্ষা খাতে, স্বাস্থ্য খাতে, প্রতিরক্ষা খাতে, জনকল্যাণ খাতে বা শিল্পখাতে দেখানো হয়েছে, যে অর্থ সমস্ত খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে, সেগুলো সম্পূর্ণভাবে জড়িত সম্পদ বন্টনের সাথে। সে সম্পদ বন্টন কি ধরনের হবে তার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হবে সে আইনের কিছুই আজ আমরা জানি না। সেই আইন যদি সম্পূর্ণ না হয়, তবে মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। সংবিধানে তিনপ্রকার মালিকানার ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা। এগুলো পরিস্কারভাবে কি ধরণের হবে, এখনো সেজন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি। এই বাজেট পেশ করার আগে দেশের রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী ও ব্যক্তিগত মালিকানা কি ধরণের হবে,তা একটা পরিস্কার আইনের মাধ্যমে প্রত্যেককে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। যেমন জমির মালিকানা একশত বিঘা করা হয়েছে , তেমনি ব্যক্তিগত মালিকানা কত হাজার বা কত লক্ষ টাকা হবে, সমবায়ী মালিকানা কত লক্ষ বা কত কোটি টাকা হবে সেগুলো ঠিক করার উপরই সংবিধানে দেওয়া প্রতিশ্রুতি নির্ভরশীল। .....তাই যে প্রতিশ্রুতি আমারা মানুষকে দিয়েছি , তা বাস্তবায়িত করতে হবে, দেশের সমস্যার সমাধান ও করতে হবে। দেশের শোষণ-ভিত্তিক অর্থনীতিকে ভেঙ্গে আস্তে আস্তে করে সম্পদের অধিকার জনগণকে দিতে হবে। এটা অবশ্য একদিনে সম্ভব নয়। বৎসরে সম্ভব নয়, এরজন্য দীর্ঘদিনের সময়ের প্রয়োজন হবে। তাই এ ভুল যাতে আমরা প্রথম থেকেই না করে বসি, সেই প্রতিশ্রুতির নিশ্চয়তা এই বাজেটে দেওয়া উচিত ছিল ....."

একটি শক্তিশালী বাংলাদেশ এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যেকোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার জন্য সংসদে এম এন লারমা সংগ্রাম করে গেছেন। এটা তাঁর বাংলাদেশের সার্বোভৌমত্বের প্রতি অগাধ আস্থা ও আনুগত্যতারই সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। ১৯৭৩-৭৪ বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উক্ত অভিব্যক্তিরই প্রতিফলন ঘটান। উক্ত আলোচনায় তিনি বলেন —

"..... মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটের শতকরা ১৬ ভাগ প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য বরাদ্দ করেছেন। মানুষের বেঁচে থাকা যেমন প্রয়োজন রাষ্ট্রের পক্ষে দেশরক্ষাও তেমনি প্রয়োজন। সরকার জোট-নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন, আমরা কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে

সাময়িক চুক্তিতে আবদ্ধ হব না; সব রাষ্ট্রই আমাদের বন্ধু। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায় আত্মরক্ষার। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তাই দেশরক্ষার জন্য আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। ডিফেন্স বাজেট করা হয়েছে ৪৭ কোটি মাত্র – জল, আকাশএবং স্থল বাহিনীকে অস্ত্র-শস্ত্র – এ সুসজ্জিত করতে হবে। তুলনামূলকভাবে দেখা যায় রক্ষীবাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫ কোটি ৮২ হাজার টাকা। তারা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবে। জল, আকাশ এবং স্থল – এই তিনটির হিসাবে দেখা যায় এক একটির জন্য প্রায় ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমার মনে হয় প্রত্যেক বাহিনীর জন্য এর তিনগুণ অর্থাৎ ৪৮ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা প্রয়োজন ছিল। যারা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, সিভিল গভর্ণমেন্টকে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে তাদের রণসম্ভার বেশী থাকবে। যারা শত্রুর সাথে মোকাবেলা করবে, তাদের থাকতে হবে আমর্স এন্ড এ্যামুনেশন এবং এজন্য সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সরকারকে মনোনিবেশ করতে হবে। ডিফেন্স -এর জন্য পাকিস্তান আমলে বাজেটের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় করা হতো। আমি এতটা অনুরোধ করছি না। আমার মনে হয়, শতকরা ১৬ ভাগ থেকে বাড়িয়ে অন্ততঃ ৩০ ভাগ ডিফেন্স বাজেট-এ বরাদ্দ করা উচিৎ ছিল। এতে ক্ষতি হতো না। ....."

বাংলাদেশের কারাগার সমূহের অব্যবস্থা, সুস্থ সামাজিক পরিবেশের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও চরম দুর্নীতির ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই এম এন লারমা কারাগারের আমূল সংস্কারের কথা সংসদে তুলে ধরেন। কয়েদীদের দুঃসহ জীবনের মর্মান্তিক দৃশ্য তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর কারাভোগের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বাজেটের উপর আলোচনাকালে কারাগার সংস্কার সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন তা হলো —

"..... মাননীয় স্পীকার সাহেব, বাজেট বক্তৃতার কোথাও কারাগারের আমূল সংস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারা জীবন সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা নাই। কারাগারে কয়েদীরা কীভাবে বন্দী জীবনযাপন করছে,যারা কারাগারে গিয়েছেন, তারাই তা পরিস্কারভাবে জানেন। বিশেষ করে ,তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরা সেখানে কীভাবে জীবনযাপন করছেন। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীর সেটা জীবন নয়। আইয়ুব খান আমাকে ২ বৎসর জেলে রেখেছিলেন এবং ১ বৎসর গৃহে অন্তরীণ রেখেছিলেন। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে ২ বৎসর জেলে ছিলাম। নিরাপত্তা আইনে বন্দী হয়ে আমি জেলে যাই এবং আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে রাখা হয়। " একখানা থালা আর ২ খানা কম্বল – এই হল জেলখানার সম্বল" জেলখানার সবাই এই ছড়া বলত। যেখানে জীবন বলতে কিছুই নাই।সেখানকার কষ্টের কথা আর কত বলব। প্রথম প্রথম আমি প্রস্রাব পায়খানায় যেতে পারতাম না। একটা ড্রামের মধ্যে প্রস্রাব পায়খানা ; তাও আবার পর্দা নাই। জেলখানার সেই অবস্থার কোন পরিবর্তন আজও হয় নাই। একটা লম্বা শেডে যে রকম অবস্থার মধ্যে মানুষকে রাখা হয় সেখানে কোন মানুষ থাকতে পারে, সে কথা কেউ চিন্তা করতে পারবেন না। একজন যদি রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে বা অন্যকোন ফৌজদারী অপরাধে বন্দী হয়ে জেলে থাকে , তাহলে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আসার সুব্যবস্থা রেখে দেওয়া উচিত। জেলে যেসব ক্রিমিন্যাল আসামী থাকে, তাদের জন্যও এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে, তারা জেল থেকে ফিরে এসে সৎ জীবন যাপন করতে পারবে। একজন আসামী যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হয়ে জেলে থেকে ১২ বৎসর পরে যখন সে বাইরে আসে, তখন সে তার সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখে না। একেবারে বৃদ্ধ বয়সে ফিরে এসে তার বাঁচবার কোন অবলম্বন থাকে না। একজন অপরাধ করে জেলে গেলে জেল থেকে তাকে ঠিকভাবে পুনর্বাসনের কেন ব্যবস্থা সরকার করেন না। জেলে থাকাকালে তার অপরাধ প্রবণতা থেকে তাকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা করা হয় না। মাননীয় জজ সাহেব বিচার করে একজন খুনীকে জেলে পাঠালেন বা চোরকে জেলে পাঠালেন। সে কারাগারে গেল। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হলো না। এ পর্যন্ত কতজনের প্রাণদন্ড হলো,কতজনের সশ্রম কারাদন্ড হলো, কিন্তু তবুও কি অপরাধের মুলোৎপাটন করা সম্ভব হলো? তাই দেখতে হবে সমস্যা কোথায়। মানুষ যদি খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে সে অপরাধ করে না। ....."

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার সংসদে নিত্য নতুন বিল উত্থাপনের মাধ্যমে অনেক আইন কানুন প্রণয়নে বাহ্যতঃ সচেষ্ট হয়। কিন্তু এসব আইন - কানুন নতুন আঙ্গিকে উত্থাপন করা হলেও বস্তুতঃ এসব আইন কানুন ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের ধারা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। "ফার্মেসী (সংশোধনী) বিল, ১৯৭৪" উত্থাপনের মাধ্যমে ফার্মেসী আইনে নতুনধারা সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক আমলের মৌলিক সনাতনী ধারা বলবৎ রেখে কেবলমাত্র রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর মেয়াদের পরিবর্তে দশবছরের মেয়াদ প্রদানের সংশোধনী সংযোজন করা হয়। এটা মূলতঃ শাসকগোষ্ঠীরই অংশ বিশেষ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে প্রণীত হয়। জনগণের স্বার্থ এখানে উপেক্ষিত থেকে যায়। তৎপ্রেক্ষীতে উপস্থাপিত ফার্মেসী বিলের উপর ২০ শে নভেম্বর, ১০৭৪ ইং সংসদে আলোচনা করতে গিয়ে এম এন লারমা বলেন —

" ফার্মেসী বিলে পাঁচ বছরের বদলে দশ বছরের সংশোধনী আনা হয়েছে। সার্বিকভাবে ফার্মেসী এ্যাক্টের আওতাভুক্ত যেসব হাজার হাজার ফার্মেসী রয়েছে সেদিকে তাকালে আমাদের কাছে বর্তমানের দুরাবস্থা পরিস্কারভাবে পরিদৃষ্ট হয়। .....

সুতরাং আজকে অষুধ তৈরীর ব্যাপারে যাদের মূল্যবান সাজেশন দ্বারা ফার্মেসীগুলি পরিচালিত হয়, তাঁরা যদি সেইসব ফার্মেসীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা না করেন, তাহলে শুধু পাঁচ বছরের জায়গায় দশ বছর করা কোন যৌক্তিকতা থাকে না। যৌক্তিকতা থাকত যদি এই ফার্মেসী

এ্যাক্টেকে সংশোধন করে ফার্মেসীগুলিকে ভালভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা হত। .....

মাননীয় স্পীকার, আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে এটা আশা করি না। কারণ আমরা সবাই ভুক্তভোগী। এই ফার্মেসীগুলিকে ঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা না করে শুধু তাদের রেজিস্ট্রেশন দেবার ব্যাপারে পাঁচ বছরের জায়গায় দশ বছর করা উচিৎ নয়।

তাছাড়া দেখা উচিত, জনসাধারণ ঠিকমত ঔষধ পায় কিনা, ঔষধ - বিক্রেতা ঠিকভাবে ঔষধ বিক্রি করে কিনা,ঔষধ তৈরী ঠিকমত হচ্ছে কিনা এবং ঔষধে - ভেজাল আছে কিনা ইত্যাদি। সেই ব্যবস্থা না করে এইভাবে ছোট ছোট সংশোধনী এনে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। সুতরাং এধরণের সংশোধনী না করে যাতে জনসাধারণের মঙ্গল হয়, দেশের উন্নতি হয়, সেই উদ্দেশ্যে বিলটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আনা উচিত। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নিকট আমি এই আবেদন জানাচ্ছি যে, এ ধরণের আইন না এনে, ফার্মেসী এ্যাক্ট করে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেশের মানুষের প্রতি নজর দেওয়া দরকার।"

বলাবাহুল্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার বদৌলতে এম এন লারমার এই মূল্যবান প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

সাংসদ এম এন লারমা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার বাক্ - স্বাধীনতার জন্য সংসদে আগাগোড়া সংগ্রাম করে গেছেন। বাংলাদেশের সরকার গোড়া থেকেই নানা বিধি-নিষেধ সম্বলিত কালা কানুনের মাধ্যমে জনগণের বাক্ স্বাধীনতা রুদ্ধ করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। "মুদ্রণালয় ও প্রকাশণা (ঘোষণা ও রেজিষ্ট্রেশন) (সংশোধনী) বিল, ১৯৭৪" প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের বাক্ স্বাধীনতার উপর চরম আঘাত হানতে সচেষ্ট হয় সরকার। উক্ত বিলের উপর ২০ শে নভেম্বর,১৯৭৪ ইং সংসদে এম এন লারমা বলেন ———

".....বাংলাদেশের সংসদ গঠিত হবার পর এমনি করে গতানুগতিকভাবে তাই একটার পর একটা বিল উত্থাপিত হচ্ছে এবং সেই বিল আইনের আকারে দেশের মানুষের উপর প্রয়োগের জন্য সংসদে গ্রহণ করা হচ্ছে। আজকেও ঠিক তদ্রুপ একইভাবে এই বিল আনা হয়েছেআমাদের সামনে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এমনই একটা ভয়াবহ আইন সংসদের সামনে উত্থাপিত করেছেন। এই আইনের ফলে মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের মুখের ভাষা খুলে বলার উপায় থাকবে না। এর ফলে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণরূপে হরণ করা হবে।

এই মৌলিক অধিকারের জন্য যুগের পর যুগ আবহমান কাল থেকে মানুষ সংগ্রাম করেছে। যে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ সংগ্রাম করেছে, আজ সেই মৌলিক অধিকারকে খর্ব করার জন্য সংসদে এই ভয়াবহ ও মারাত্মক বিল উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ভয়াবহ ও মারাত্মক আইন দ্বারা সংবিধানের ৩৯অনুচ্ছেদকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে এই বিল আনয়ন করা হয়েছে। সংবিধানে ৩৯ অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি মানুষের চিন্তা ও বাক্ স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। ৩৯ অনুচ্ছেদে আছে —

(১) চিন্তা বিবেকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা , মানহানি বা অপরাধ - সংঘটন, প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে ——

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, যদি বাধা নিষেধ সাপেক্ষে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়ে থাকে, তবে সেই বাধা নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের এমনকি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যে পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, জনশৃঙ্খলা-ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি ও অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে নিশ্চয়তাদানের কী অসুবিধা দেখা দিয়েছে,যার জন্য আজ এধরণের আইন আনা হয়েছে? চিন্তা বিবেক ও বাক্ স্বাধীনতার নিশ্চয়তার সম্পূর্ণরূপে হরণ করে আইনের মাধ্যমে কার্যকরভাবে পালনের জন্য কী প্রয়োজনে এই আইন সরকার সংসদে উত্থাপিত করেছেন? .....

এই আইন করে তারা কি দেশে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে? সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন করে আজকে সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে দেশের কাজ না করে আওয়ামী লীগ সরকার যে কাজ করে চলেছে ভাবতে অবাক লাগে। একের পর এক কালাকানুন ও গণবিরোধী আইন করে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের বাক্ স্বাধীনতাকে হরণ করে, বাংলাদেশের মানুষের এগিয়ে চলার পথ সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে দিয়ে সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত "আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও বাক্ স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবেনা"—এই মৌলিক অধিকারকে খর্ব করেছে। আজকে আমাদের দুর্ভাগ্য । অধিকার আদায়ের জন্য মানুষ তার জীবনকে উৎসর্গ করে। এই উৎসর্গের ফলস্বরূপ আজকের এই স্বাধীন বাংলা। এই স্বাধীন বাংলাকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গড়ে তোলার দায়িত্ব অপরিসীম।

সেই দায়িত্ব পালনে সংবাদপত্রের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, সংবাদপত্রে মানুষের বাক্ স্বাধীনতা প্রতিফলিত হয়। এই বাক্ স্বাধীনতা যদি না থাকে, তাহলে আজকে মানুষ তার মনের কথা কিভাবে জানবে? কিভাবে জানবে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে, কোথায় কোথায় অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে, কোথায় কোথায় গলদ দেখা

দিয়েছে? সেজন্য তার বাক্ স্বাধীনতা যদি না থাকে, সরকারকে এগুলি দেখিয়ে দেবে কিভাবে? সরকারের ব্যর্থতা যদি সংবাদপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব না হয়, তাহলে সরকার কিভাবে তার ভুল সংশোধন করবে? .....

আজকে বাংলাদেশের দুর্নাম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। টোকিওতে ইন্টারন্যাশানেল প্রেস ইনস্টিটিট -এ যে কনফারেন্স হয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশের সংবাদপত্র সম্পর্কে এমন একটা রূঢ় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই। আজকে তদ্রুপ এমন একটি আইনে শুধু সংবাদপত্রের নাম করে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের অধিকারকে খর্ব করা হল। এর জবাব সরকারের নিকট চাই। .....

আজ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য মানুষের কণ্ঠরোধ করার জন্য বিল আনা হচ্ছে। চিয়াং-কাইশেক, সিংম্যান রীর মতো অটোক্রেটরা মানুষের বাক স্বাধীনতা , সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাননি। আইয়ুব খানের সরকার,ইয়াহিয়া খানের সরকার এই স্বাধীনতা দিতে চাননি। সেই আইয়ুব খান,ইয়াহিয়া খান আজকে কোথায় ভেসে গেলেন। আজ আমরা কেন ঐ সব আইনের পুনরাবৃত্তি করতে যাব?

সংবাদপত্রের মাধ্যমে মানুষের মনের কথা প্রকাশিত হয় । মনের ভাব প্রকাশের এই পথ যদি সম্পূর্ণরূপে রোধ করে দেওয়া হয় , তাহলে এখানে গণতন্ত্র আর থাকবে না। গণতন্ত্র যদি না থাকে, তাহলে সমাজতন্ত্র কোন দিনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সংবিধানের এই উক্তি —"মানুষের ওপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে " কোনদিনই বাস্তবায়িত হবে না।.....

মাননীয় স্পীকার স্যার, সংবাদপত্রের অধিকার খর্ব করার পেছনে সরকারের কি যুক্তি আছে, জানি না। কিন্তু একটা কথা সবসময় আমাদের মনে থাকবে যে, এই সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার পর একের পর এক অনেক পত্রিকার কণ্ঠরোধ করে দিয়েছেন। যেমন, 'লাল পতাকা','গণশক্তি', 'মুখপত্র,'' দি স্পোকসম্যান'। এমনিভাবে বিভিন্ন পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। তদুপরি , সাম্প্রতিককালে 'দৈনিক গণকণ্ঠের' আল মাহমুদকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে রাখা হয়েছে, যাঁর কথা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশকে টিটকারী করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে জাতিসংঘের সঙ্গে জড়িত দি এ্যামন্যাস্টি ইন্টারন্যাশান্যাল সম্প্রতি মন্তব্য করেছে —— "Poet Al - Mahmood is the prisoner of conscience."

মাননীয় স্পীকার স্যার , এই বিল সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি সব কথা বলব না। সরকারকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে অধিকারের প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিয়েছেন , যে অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন, সেই সংগ্রামের কথা ভুলে যাবেন না। সেই সংগ্রামের কথা যদি ভুলে যান, তাহলে ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবেন না। ইতিহাস আইয়ুব খানকে,ইয়াহিয়া খানকে যে পথে নিয়ে গিয়েছে, আপনাদেরকেও ঠিক সেই পথে নিয়ে যাবে।"

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কালাকানুনের অন্যতম জঘন্য আইন হলো বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ সন। ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা বিল সংসদে উপস্থিত হলে অনায়াসে পাশ হয়ে যায়। ফলতঃ আপামর সংগ্রামী জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে রুদ্ধ করার পথ প্রশস্ত হয়ে উঠে। ২১ শে নভেম্বর, ১৯৭৪ ইং " বিশেষ ক্ষমতা (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ১৯৭৪ "বিবেচনা কালে সাংসদ এম এন লারমা এর সুদূরপ্রসারী জঘন্য রূপ তুলে ধরেন এভাবে ——

"মাননীয় স্পীকার, স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট এর আওতাভুক্ত আসামীদের কঠোর সাজা দেওয়ার জন্য স্পেশাল ট্রাইবুনাল করা হয়েছে এবং সেই স্পেশাল ট্রাইবুনাল -এর আসামীদের দোষে প্রমাণিত হওয়ার জন্য পুলিশ কর্তৃক যে মাল মসলা পাওয়া যায়, সেটা আসামীর পক্ষেই হোক অথবা বাদীর পক্ষেই হোক অথবা স্পেশাল ট্রাইবুনালের পক্ষেই হোক –সেটাকে অগ্রাহ্য করে নতুন করে পুনর্বিবেচনার জন্য স্পেশাল ট্রাইবুনালকে ক্ষমতা দিয়ে আজকের এই সংশোধনী আনা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, সাহেব, এটা স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট, যেটাকে অত্যন্ত শক্ত আইন হিসাবে তৈরী করা হয়েছিল। এটা সম্বন্ধে সরকার পক্ষের ভাষায় ছিল যে, যারা দুর্নীতি পরায়ণ, যারা দেশের শত্রু , যারা দেশের ভিত্তিকে নষ্ট করে দিতে চায়, তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য হল এই কঠোর আইন। অথচ আজকে আবার পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে সেটাকে শিথিল দেওয়ার জন্য যে সংশোধনী আইন আনা হয়েছে, এটাকে একটা প্রহসন ছাড়া কিছু বলা যায় না। এটা বিরোধী দলগুলোর কণ্ঠরোধ করার জন্যই শুধু আনা হয়েছে। .....

আমরা এটাকে কালোতম আইন বলেছিলাম, আমাদের সেই কালোতম আইন কথাটি ঠিকই ছিল। যারা চোরাকারবারী, যারা দেশের শত্রু, তাদেরকে এই ভাবে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশোধনীটি যদিও ছোট, কিন্তু এর বাস্তব প্রতিক্রিয়া খুবই ভয়াবহ। তাই এই মহান সংসদের মাননীয় সদস্য এবং সদস্যাগণ এটাকে গ্রহণ করবেন কিনা, এটা গ্রহণ করা উচিত কিনা, এই বিবেচনার ভার রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।"

বস্তুতঃ তৎকালীন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি ও একনায়ক সুলভ কর্তৃত্বপনা ধীরে ধীরে চরম আকার ধারণ করেছিল । বিশেষ ক্ষমতা আইনের বলে বিরুদ্ধবাদী সকল সংগ্রামী জনতার উপর তখন সরকার নির্বিচারে ধরপাকড় ও দমনপীড়ন শুরু করে দেয়। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন তথা মুক্ত গণতন্ত্র চর্চার সকল ক্ষেত্র রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বাকশাল নামক একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কাঠামোকে করায়ত্ব করা হতে থাকে। বিরোধী দলের সদস্যদের বাকশালে যোগ দিতে বাধ্য করা

হচ্ছিল। সমগ্র বাংলাদেশের বঞ্চিত অবহেলিত ও নির্যাতিত জনগণের একনিষ্ঠ বন্ধু ও আপোষহীন সংগ্রামী এম এন লারমাকে পাকিস্তানপন্থী, বিরুদ্ধবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্রজাতীয়তাবাদী প্রভৃতি মনগড়া অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁর উপর দমন পীড়ন শুরু হতে থাকে। জুম্ম জনগণকে পাকিস্তানের দালাল হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের উপর দমনপীড়নের মাত্রা চরম আকার ধারন করে। অবশেষে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের লক্ষ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হন মহান নেতা এম এন লারমা।

এম এন লারমার গোটা আত্মনিবেদিত সংসদীয় জীবন ছিল সংগ্রামে ভরপুর। বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি সংসদে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান চিন্তা ভাবনা অকপটে প্রকাশ করে গেছেন এবং তাঁর চিন্তা ও আদর্শের সপক্ষে তথা বাংলাদেশের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ন্যায্য অধিকারের জন্য নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন। সংসদে তাঁর এই সংগ্রাম ও সাহসিকতা বাংলাদেশের ব্যাপক জনগণের মাঝে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলাদেশের আপামর জনগণের মাঝে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেন "লারমা" নামের একজন তুখোড় সংগ্রামী হিসেবে। বস্তুতঃ তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সুখী সমৃদ্ধশালী আত্মনির্ভরশীল একটি স্বাধীন বাংলাদেশের— যেখানে থাকবে না কোন প্রকারের জাতিগত ও শ্রেণীগত শোষণ, নিপীড়ন, হিংসাদ্বেষ, হানাহানি। যেখানে থাকবে জাতিতে জাতিতে ভালবাসা ও পরস্পর অধিকারের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীলতা।

তিনি কখনোই উগ্রজাতীয়তাবাদী সংকীর্ণ ভাবাদর্শে তাড়িত হননি। তিনি জুম্ম জনগণের জন্য কখনো দাবি করেন নি বাংলাদেশ থেকে স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের। জুম্ম জনগণের ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত স্বশাসনের মাধ্যমে তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার অকৃত্রিম আকাঙ্খা পোষণ করতেন তিনি। তাঁর সংগ্রামকে তিনি কখনোই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিপরীতে পরিচালিত করেন নি। পক্ষান্তরে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে মজবুত করতে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রয়াসী। ষাট দশকে স্বৈরাচারী পাকিস্তান বিরোধী গণআন্দোলন সহ স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর সংসদীয় জীবনের টানা অর্ধ যুগের অধিক দিন পর্যন্ত তিনি জুম্ম জনগণসহ বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, জেলে, মাঝিমল্লা,তাঁতী,কামার,কুমোর কর্মচারী, নির্যাতিতা মহিলা প্রভৃতি আপামর জনগণের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভৃতি মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য এবং সর্বোপরি একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলার জন্য আপোষহীন সংগ্রামে নিয়ত ব্যাপৃত ছিলেন। তাই মহান নেতা এম এন লারমা কেবল জুম্ম জনগণের এক উজ্জ্বল আলোক বর্তিকাও সংগ্রামী নেতা নন, তিনি ছিলেন সমগ্র বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, পেশাজীবী, সংখ্যালঘু তথা নির্যাতিত নিপীড়িত অধিকার হারা জনগণের এক বলিষ্ট নেতা — যার চিন্তা-চেতনা, সংগ্রামী প্রত্যয় ও দৃঢ়তা বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত ও অধিকারকামী মুক্তি পাগল জনগণের চির প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

জুম্ম জাতি

● শ্রী এস. বোস. জার্নাল

মোরা জুম্ম জাতি
দশভিন্ন ভাষাভাষী পার্বত্যবাসী,
মোরা যেন একটি মায়ের ক'টি সন্তান
লভেছি মুক্তি মন্ত্র দানিতে নব জীবন।
সুশোভিত সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা
মোদের জননী মাতৃভূমি পার্বত্য চট্টলা,
বন-উপবন পাহাড়-পর্বত গিরিকন্দর
নদ-নদীর তটে বিস্তৃত মাঠ-ঘাট কত মনোহর।
ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা জননী জন্মভূমি
নির্ঝর সুশীতল মা জননীর দুগ্ধরূপী স্রোতস্বিনী,
এ মায়ের কোলে লালিত পালিত মোরা একদা জুমচাষী
তাই মোদের জাতির ঐতিহাসিক নাম - জুম্ম জাতি।
নহি মোরা ভিন্ন জাতি নেই কোন ভেদাভেদ
জুম্ম জাতীয়তাবাদের মূলে হয়ে সকলেই সমবেত,
অমল-ধবল প্রীতি বন্ধনে ঘুচিব একসাথে সকল দুর্গতি
অনন্ত - সজলে দুনিয়া প্রলয়ে মোরা রহিব এক জাতি।
মোরা জুম্ম জাতি।

প্রসঙ্গ ঃ মোনঘর শিশু সদন (অনাথ আশ্রম)

● শ্রীসুপ্রিয়

"আমি জানি আমার রঙ্গ কৌতুকের আওতা থেকে আমার পুত্রবধু বিমল কান্তির বৌও বাদ পড়েনি। মনে রেখো নাচ, গান, হাস্য কৌতুক জীবনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের পর মনকে সরস ও সজীব রাখার জন্য রঙ্গ কৌতুকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। হোক সেটা আদি রসাত্মক। আমার কাছে সেটা কোন ব্যাপারই নয়।" উক্ত বক্তব্যটি কোন দার্শনিক বা রোমান্টিক সাহিত্যিকের আদি রসাত্মক অভিব্যক্তি নয় বরঞ্চ নির্বাণকামী একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকের। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিস্থ রাঙ্গা পান্যার "মোনঘর" শিশু সদনের প্রধান প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর শিষ্য কীর্তি নিসানকে লেখা চিঠি থেকে উক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামের পাশাপাশি কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল সেবার নামে যে বেসাতি চালিয়ে যাচ্ছে সে কথা আজ অনেকেই জানেন। ধর্মের লেবাস পরে এরা যেমন অপকর্মে লিপ্ত তেমনি বিভিন্নভাবে আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াও যে করছে তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। বিদেশী কোন শক্তির ক্রীড়নক হয়ে এই গোষ্ঠীটি পাবর্ত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নানাভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করে। এদের হীন কর্মকান্ডের গোমর ফাঁস করে জনগণের মধ্যে এই কতিপয় ধর্ম ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে সতর্কতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকেও আজ কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না। সম্প্রতি এসব ভন্ডভিক্ষুদের কুকীর্তি সম্পর্কে মোনঘরের ছাত্র- ছাত্রীদের পক্ষ থেকে একটা বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া রাঙ্গামাটিস্থ সচেতন মহল থেকেও একটা বিবৃতি প্রকাশ করে প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর মত ধর্মীয় কুলাঙ্গার ও আন্তর্জাতিক চরদের হীন মুখোশ উন্মোচন করে দিতে বেশ তৎপরতা চালাচ্ছেন যা অত্যন্ত প্রসংশনীয় ও সময়োপযোগী। তাদের ভন্ডামী যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের প্রচারিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই অত্র লেখার অবতারণা।

জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রচেষ্টায় খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থানায় বোয়ালখালী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় "দশবল বৌদ্ধ রাজবিহার।" এই ভিক্ষুর পৃষ্ঠপোষকতায় দীঘিনালা এলাকায় সীমিত আকারে হলেও ধর্ম প্রচারের কাজ চলতে থাকে। তখুন উদোল বাগান নামক গ্রাম থেকে তিনজন গরীব ছেলে রংবস্ত্র (চীবর) গ্রহণ করে জ্ঞানশ্রী ভিক্ষুর শিষ্য হিসেবে দশবল বৌদ্ধ রাজবিহারে থেকে লেখাপড়া চালাতে থাকে। তাদের নাম বিমলতিষ্য, প্রজ্ঞানন্দ ও শ্রদ্ধালংকার। তাদের সমসাময়িক পাবলাখালি ও বাঘাইছড়ি গ্রাম থেকে যথাক্রমে জিনোপাল ও প্রিয়তিষ্য নামের আরো দুইজন ছাত্র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্নদেশী বিদেশী সাহায্য সংস্থার অর্থানুকুল্যে বিমলতিষ্য ঢাকাতে প্রজ্ঞানন্দ ও শ্রদ্ধালংকার চট্টগ্রামে ভিক্ষু অবস্থায় দর্শন ও পালি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে থাকে। বিমলতিষ্য তখন থাকত কমলাপুরস্থ বাসাবো রাজীক বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর তত্ত্বাবধানে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অবস্থায় বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর কাছাকাছি থাকতে থাকতে বিমলতিষ্য বিদেশী দাতা সংস্থার ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে আসে এবং নিজ এলাকার বোয়ালখালী দশবল বৌদ্ধ রাজবিহারের সাথে বোয়ালখালী অনাথ আশ্রমের মঙ্গলার্থে বিশেষ ভূমিকা নেয়। অপরদিকে প্রজ্ঞানন্দ ও শ্রদ্ধালংকারও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে অনাথালয়ের মাধ্যমে সেবাকর্মে জড়িয়ে যায়। তখন বোয়ালখালী অনাথ আশ্রমে প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকে প্রিয়তিষ্য এবং উৎপাদনের দায়িত্বে থাকে জিনোপাল। বিমলতিষ্য, প্রজ্ঞানন্দ ও শ্রদ্ধালংকার তখন অধ্যায়নরত। বোয়ালখালী অনাথ আশ্রমের পাশেই ময়নামতি নামের এক নারীর প্রতি উৎপাদনের দায়িত্বে থাকা জিনোপাল ভিক্ষু আকৃষ্ট হয় এবং অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। আর্থিক স্বচ্ছলতার সুবাধে বিভিন্ন বৈষয়িক সুবিধা দিয়ে ভোগবিলাসিতার জীবন শুরু করে দেয় জিনোপাল। এই অবৈধ সম্পর্কের কথা জানাজানি হলে গ্রামবাসী তার চীবর (রংবস্ত্র) কেড়ে নেয় এবং উন্মত্ত জনতা গুলি করে তাকে আহত করে। অবশেষে এই জিনোপাল চট্টগ্রামের বেসরকারী কলেজ থেকে বি এ পাশ করে বর্তমানে কৃষি ব্যাংকে চাকুরীরত বলে জানা যায়। এভাবে অপকর্মে জড়িয়ে যায় অন্যান্যরাও।

১৯৭৬ সালের দিকে রাঙ্গামাটি শহরের অদূরে রাঙাপান্যা নামক স্থানে আজকের "মোনঘর শিশু সদন" (অনাথ আশ্রম) প্রতিষ্ঠার কাজ পুরোদমে শুরু হয়। শ্রদ্ধালংকার ভিক্ষুকে বিহারাধ্যক্ষ করে রাঙাপান্যার সামান্য জায়গায় বিহার তৈরী করা হয়। মনোঘর প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকে এলাকাবাসী এর বিরোধিতা করে। বিরোধিতাকারীদের মধ্যে যোগেন্দ্র লাল দেওয়ানের নাম উল্লেখ করা যায়। স্থানীয় জনসাধারণের আপত্তি সত্ত্বেও কিছু প্রভাবশালী কুচক্রী মহলের উদ্যোগে অনাথ আশ্রমটি কোন রকমের টিকে রাখার চেষ্টা করা হয়। কৌশল হিসেবে তখন স্থানীয় গরীব ছেলে-মেয়েদের এই অনাথ আশ্রমে ভর্তি করা হয়। রাঙ্গামাটির প্রভাবশালী লোকদের নানাভাবে ব্যবহার করে প্রতিবাদের তীব্রতা ক্রমশ কমতে কমতে শেষ হয়ে যায়। তখন স্থানীয় লোকদের থেকে প্রচলিত দামের এক হাজার টাকা বেশী দিয়ে বিহারের জন্য জমি কিনে এলাকা বাড়ানো হয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে মোনঘর প্রতিষ্ঠানটির এলাকা বেড়ে যায়। ১৯৭৯-৮০ সালের দিকে বিদেশী নাগরিক ও এক দাতা সংস্থার একজন কর্মকর্তার ঘন ঘন আনাগোনা শুরু হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে। মোনঘরের সাথেও তার পূর্বের যোগাযোগ গভীরতর হতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দীঘিনালা নিবাসী পিযুস কান্তি চাকমা (ফরাজয়)- এর ছেলে তখনকার সময়ে রাঙ্গামাটিতে চাকুরী করতো। তার বাসায় থেকেই ছোট বোন দীপ্তি কলেজে পড়তো। কিন্তু বিশেষ এক অনিবার্য কারণে দীপ্তির

বড় ভাই মোনঘর থেকে পাত্র খুঁজে দেয়ার জন্য বিমলতিষ্যকে অনুরোধ করে। এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন বিমল ভিক্ষু। অবশেষে দীপ্তিকে জনৈক বিদেশী নাগরিকের সাথে রাঙ্গামাটির আনন্দ বিহারেই বিয়ে দেয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই বৈবাহিক সম্পর্কের সুবাদে পরবর্তীতে দাতা গোষ্ঠীর সাথে মোনঘর কর্তৃপক্ষের গভীর যোগাযোগ সৃষ্টি হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির বিস্তৃতি ঘটে দ্রুতগতিতে।

এখন মোনঘর আর শুধু রাঙ্গামাটির রাঙাপান্যাতে সীমাবদ্ধ নয়। ঢাকার মীরপুর-১৩-এ সাক্ষ্যমণি বৌদ্ধবিহার এবং বনফুল নামের শিশু সদন বেশ প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন এলাকায় সমাজ সেবার অজুহাতে তাদের শাখা প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি ঘটে চলেছে। মোনঘর শুধু আকার আয়তনে বৃদ্ধি পাচ্ছে না– বৃদ্ধি পাচ্ছে তার কতিপয় ভিক্ষু বেশে থাকা পরিচালকদের অপকীর্তি, অসামাজিক কার্যকলাপ এবং একই সাথে আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার আন্দোলনে প্রতিক্রিয়ার মাত্রাও।

সম্প্রতি মোনঘরের পৃষ্ঠপোষকতায় অধ্যায়নরত অধিকাংশ ছাত্র - ছাত্রী প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তি বিশেষতঃ ভিক্ষুদের দুর্নীতি ও কুকর্ম সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার, আর্থিক দুর্নীতি ও নারী সংক্রান্ত কেলেংকারী নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানটির বেশ কিছু কর্মকর্তাও অসন্তুষ্ট বলে জানা যায়। প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি ও ঘৃণ্য কার্যকলাপের কথা ঢাকা, চট্টগ্রাম বা রাঙ্গামাটির কমবেশী সবাই জানেন। তার ভোগবিলাসী জীবন দেখে অনেকেই তিক্ত বিরক্ত হয়ে বিবেকের তাড়নায় প্রতিষ্ঠান ছেড়েছেন। নিম্নের কীর্তি নিশানকে লেখা প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর চিঠি থেকে তার জঘন্য ও কলুষিত চরিত্রের প্রকাশ পায় যা স্বধর্মের চরম পরিহানি ও বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজের কলংক।

VEN. PRAJNANANDA MAHATHERA

VEN. [illegible] MAHATHERA

[illegible]

(২)

[illegible]

VEN. PRAJNANANDA MAHATHERA

[illegible]

৫/৪/৯৬

[illegible]

[স্নেহের

নিশান ৫।৪।৯৩

আজ সারাদিন মিটিং করার পর আনন্দ বিহারে ফিরে এসেছি। এখানেও বিকালে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। রাত ১০টা বাজার কিছুক্ষণ আগ থেকে ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে তোমাকে লিখতে বসলুম। কতটুকু জোরালোভাবে তোমার কাছে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারলুম এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েগেল। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বুঝার ক্ষমতা আশা করি তোমার জন্মেছে। যে অস্থিরতার মধ্যে রয়েছ তজ্জন্য আমি চিন্তান্বিত। সদ্য M. A. Pass করে বের হবার পরও আমাকে তোমার মত একটা সাংঘাতিক অস্থিরতায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আমি হস্তরেখাবিদ আবদুর রহমান তলোয়ারীর কাছে আমার হাত দেখানোর জন্য গিয়েছিলাম। আমার পরামর্শ যদি সত্যিই তোমার প্রব্রজ্যা ত্যাগ করতে ইচ্ছা হয়— তাহলে অন্ততঃ তার আগে একজন নাম করা হস্তরেখাবিদের কাছে গিয়ে তোমার ভাবী জীবনের ভাল মন্দের দিকগুলো একটু পর্যবেক্ষণ কর। পতঙ্গের মতো অগ্নিতে আত্মাহুতি দিওনা। তলোয়ারী সাহেবকে আমি খোলাখুলিভাবে বলেছিলাম—"আমি বিয়ে করলে আমার সাংসারিক জীবন কি রকম হবে।', তিনি আমার হাত কমপক্ষে ৩০ মিঃ খুব সুক্ষ্ম ভাবে অবলোকন করে বলেছিলেন—'আমার সাংসারিক জীবন (সংসারে ঢুকলেও) ৮০% সুখের হবে না। তবে বিয়ে আমি করতে পারবো। এটা নিঃসন্দেহ। তুমি ও কি আমার মতো তোমার ভবিষ্যৎ ভাগ্য একটু যাচাই করে দেখবে? রং বস্ত্র ত্যাগের আগে তা একটু করে দেখার জন্য আমার একান্ত অনুরোধ রইল।

ইতি (স্বাক্ষর) ৫।৪।৯৩

পুনশ্চঃ তুমি এখনো আমাকে ভালভাবে চিনতে পারনি। এটা একেবারে ৬০% সত্য এই বলে ধরে নিচ্ছি। আমি পাগল হলেও কিন্তু সীমা ছাড়া পাগল নই। তবে পাগালামী আমি করি। আমার নিজস্ব প্রয়োজনে আমি পাগল সাজি। রঙ্গ তামাশাও করি। এখানে রাঙ্গামাটিতে আমার কমপক্ষে ১২জন শ্বশুর শ্বাশুরী রয়েছেন। আমি আমাকে জনগণের কাছে অদ্বিতীয় একজন পুরুষ বা ভিক্ষু হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাইনা। কিছু কিছু সমালোচনা থাকা ভাল নয় কি? আমিও ইচ্ছে করেই কিছু কিছু সমালোচককে ছায়ার আমার মতো রাখতে আগ্রহী। কারণ, একেবারে ১০০% প্রশংসা মানুষকে বিপথগামী করে। সমাজকে সেবা করতে নেমেছি। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় তথা আবহাওয়ায় আমার কাজ ক্রম অগ্রসরমান। তাই নিজের পেছনে পেছনে কিছু কিছু বিতর্কিত ব্যাপার স্যাপার ছায়ায় মতো অনুগামী হিসেবে রাখা ভাল নয় কি? আসলে তুমি আমার মনের কোমল অনুভূতিগুলো বুঝার ক্ষমতা অর্জন করতে পারনি। আমার বড় দাদারা সহ আমি অত্যন্ত কৌতুক প্রিয়। রঙ্গ তামাশার মধ্যে থাকতে ভালবাসি। এটা বোধ হয় হয় আমাদের রক্তের দোষ অথবা গুণ। আমার বড় ভাইদের কথা বলতে পারবোনা—তবে আমি শত পাগলামী বা রঙ্গ কৌতুকের মধ্যে থাকলেও রাশ টেনে ধরার ক্ষমতা আমার রয়েছে। বাস্তবকে আমি বাস্তব হিসেবে জানি এবং অবাস্তবকে অবাস্তব। তা জানি বলেই হয়তো মোনঘর এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে। আমি জানি আমার রঙ্গ কৌতুকের আওতা থেকে আমার পুত্রবধু বিমল কান্তির বৌও বাদ পড়েনি। মনে রেখো নাচ গান হাস্যকৌতুক জীবনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের পর মনকে সরস ও সজীব রাখার জন্য রঙ্গ কৌতুকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। হোক সেটা আদি রসাত্মক। আমার কাছে সেটা কোন ব্যাপারই নয়। তোমার অবর্তমানে তোমার মা ও তোমার দাদীকে কুকুর বেড়ালের মত তাড়াবো —তা ভাবতে পারলে কি করে? তা লেখার আগে একটুও ভাবনি—এতে আমি কি রকম আহত ও ক্ষত বিক্ষত হতে পারি? আমার ব্যাপারে তোমার এ বুদ্ধি দীপ্ত Assumtion এর জন্য দু ফোটা অশ্রু উপহার নাও। সাবাস! তোমার Assumtion - এ Aassumtion এর বানানটা ভুল হলো কিনা—জানিনা। ভুল হলে শুদ্ধ করে পড়ো। হাতের কাছে Dictionary ও নেই—একটু দেখতাম। জানতো-ইংলিশে. তো আমি সেকসপীয়ারেরকেও হার মানাই। মাঝে মাঝে ইংরেজী বাক যুদ্ধে সেকসপীয়র, টমাস হার্ডি, বেকন, প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিরাও কুপোকাৎ হয়ে পড়েন। যাই হোক— পুনশ্চে শেষ কথা—তোমাকে তুমি ভাল ভাবে দেখ। সেই সঙ্গে আমাকেও একটু সঙ্গে রেখো। কারণ তোমাকে ছাড়াতো আমি অচল। আর না।

ইতি (স্বাক্ষর) ৫।৪।৯৩

বিঃ দ্রঃ প্রতিভাকে যদি সত্যিই বিয়ে করতে চাও এবং প্রতিভারও যদি মত থাকে তাহলে ১০০% নিশ্চিন্ত থাক। তোমাকে আমি গোরেং টুক টুক করে বিয়ে দিয়ে দেবো।]

প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর রঙ্গরসিকতা তথা দৈহিক চাহিদার কোপানলে পড়ে যারা রেহাই পায়নি তারা হচ্ছে বিশাখা ও সুজাতা ভবনের কানন দেবী চাকমা, চিংবা মার্মা, নিপুনিকা দেওয়ান, শঙ্গমিত্রা দেওয়ান, পূর্বা খীসা, সুখী দেওয়ান, সঞ্চিতা চাকমা, বাসনা চাকমা, নীরা দেওয়ান, জেসমিন দেওয়ান, সুমিনা দেওয়ান, মেপ্রু মার্মা, শিল্পি চাকমা, সূচনা চাকমা, বীণা চাকমা, মায়াদেবী চাকমা, জোনাকী চাকমা, সুজাতা চাকমা, জয়ন্তী চাকমা, শুক্লা খীসা, শেফালী চাকমা, অনুরূপা চাকমা, প্রতিভা রাণী চাকমা, বিনতা চাকমা, পূর্ণিমা চাকমা ও ভারতী দেওয়ান। অনাথ আশ্রমের আশ্রয় পাওয়া উপরোক্ত অসহায়া মেয়েদের নির্যাতন করা হচ্ছে। সে সমস্ত মেয়েরাই ভিক্ষুদের থেকে আর্থিক ও বৈষয়িক সুবিধা বেশী পায়, যারা প্রজ্ঞানন্দ ও শ্রদ্ধালং-কারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে। নারী ঘটিত অনেক অপকর্মের হোতা প্রজ্ঞানন্দ, শ্রদ্ধালংকার ও ধর্মাদিত্য নামের ভিক্ষুদের বিরুদ্ধে অনেকের প্রচন্ড ক্ষোভ থাকলেও কেউ কিছু মুখ খুলে বলতে সাহস পায়না। মূলতঃ যারাই এসব বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অপকর্ম দেখেও চুপচাপ তারাও প্রকারান্তরে এসব কার্যকলাপ অনুমোদন করে কিংবা নিজেরাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসবে জড়িত বলে এলাকাবাসীর ধারণা । অনেক বছর আগে থেকেই ভিক্ষুদের এই কার্য্যকলাপের কথা জানাজানি হলেও এর জোরালো প্রতিবাদ তেমন হয়নি। অথচ স্থানীয় লোকজন তথা রাঙ্গামাটি ও ঢাকার অনেক মহল চায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয় প্রতিষ্ঠানটির ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হোক। সমাজ সেবার দোহাই দিয়ে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা স্বেচ্ছাচার, দুর্নীতি ও অপক র্মে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজনবোধ করলেও আজ পর্যন্ত কেউ এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করার সৎসাহস দেখায়নি। নৈতিক মূল্যবোধ থেকেও কোন সুখী মহল কেন এতকাল টুশব্দটি করেনি সেটাই আজ অবাক করার বিষয়।

ধারণা করা হয় যে, মোনঘরের মাধ্যমে পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠী কোন না কোনভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান আন্দোলনে প্রভাব রাখতে চায়। পশ্চাদপদ জুম্ম জনগোষ্ঠীর সরলতার সুযোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা বরাবরই শোষণ করার পাঁয়তারা করছে। কাজেই তাদের সাহায্যের অন্তরালে কেবল আর্থিক বা ব্যবসায়িক স্বার্থই নয় রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত। আপাত দৃষ্টিতে মোনঘরের মত সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবার কর্মসূচী পরিলক্ষিত হলেও রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার গোপন পরিকল্পনাও রয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। যেহেতু এই দুশ্চরিত্র নির্লজ্জ ধর্মগুরুরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন সম্পর্কে দেশে ও বিদেশে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অনেক প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা রেখেছে সে কারণে তাদের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া মোটেই অমূলক নয়। যে বিষয়টি ইদানিং পরিস্কার হয়ে উঠেছে সেটি হচ্ছে মোনঘরের সাহায্য পুষ্ট ছাত্রদের ব্যবহার করে জুম্ম ছাত্র আন্দোলনের ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। যে ছাত্ররা এই লম্পট ভিক্ষুদের কার্যকলাপকে সমালোচনা করবে কিংবা ভিক্ষুদের কথামত কাজ না করবে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলেই ছাত্ররাও নিরুপায়। ফলে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনকে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে তারা বাধ্য। অথচ আন্দোলনকামী ছাত্রদের এই অংশটিও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামিল হতে চায়। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কোন কুচক্রী মহলের প্ররোচনায় নিয়ন্ত্রিত না হয়ে মোনঘরের প্রগতিশীল ও সচেতন ছাত্র-ছাত্রীরা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে অধিকতর অংশগ্রহণ করে ভূমিকা রাখুক এটা সবাই কামনা করে। অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা ছাত্র সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন অংশ হিসেবে সকল অন্যায়, দুর্নীতি ও অপকর্মের বিরুদ্ধে ছাত্ররা রুখে দাঁড়াবে এটাই স্বাভাবিক এবং বিবেকবান যুব তথা জুম্ম সমাজ মোনঘরের পরিচালক ভন্ড প্রজ্ঞানন্দ, শ্রদ্ধালংকার ও ধর্মাদিত্য ভিক্ষুদের মোনঘর শিশু সদনের অভ্যন্তরস্থ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, দালালীপনা, ধর্ম ও সমাজবিরোধী হীন কার্যকলাপ, নারী নির্যাতন,

বিভেদপন্থীদের ক্ষমা নেই

● শ্রীউজ্জ্বল

ঋতু চক্রের নিয়মানুসারে বছর পরিক্রমায় আবারও আমাদের মাঝে উপস্থিত হলো জাতির ঐতিহাসিক শোক দিবস ১০ই নভেম্বর ১৯৯৫ইং। জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের দোসর গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র "ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া" নীতির ভিত্তিতে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত চরমভাবে পদদলিত করে ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ইং এক অতর্কিত সশস্ত্র হামলা চালিয়ে জুম্ম জাতির অবিসংবাদী নেতা, জাতির মহান কান্ডারী, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের অগ্রপথিক, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ সমিতির অন্য আটজন আদর্শবান, প্রতিভাবান ও একনিষ্ঠ বিপ্লবী যোদ্ধা— পরিমল বিকাশ চাকমা, শুভেন্দু প্রবাস লারমা, অপর্ণা চরণ চাকমা, অমর কান্তি চাকমা, মনিময় দেওয়ান, সৌমিত্র চাকমা ও অর্জুন ত্রিপুরাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

বিশ্বের প্রতিটি জাতির জাতীয় জীবনে যেমনি থাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাবিধুর দিন তেমনি জুম্ম জাতির জাতীয় জীবনেও ১০ই নভেম্বর হচ্ছে জাতীয় শোকের দিন। তাই এই জাতীয় শোক দিবসের স্মরনিকায় আমি আমার সামান্য লেখার মাধ্যমে বিভেদপন্থী চার কুচক্রীদের তথাকথিত বিপ্লবী মুখোশের অন্তরালে তাদের বীভৎস রূপটি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। বিভেদপন্থীরা এক সময় আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে কাজ করেছিল আর অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে নিজেদের বীভৎস রূপকে আড়াল করে পার্টির অনেক উচ্চ পদেও অধিষ্ঠিত ছিল। সে সময় তারা রাজনৈতিক দুরাকাঙ্খায় দিবাস্বপ্নে বিভোর ছিল। দেশ ও জাতির সেবার নামে তারা সন্দেহাতীত প্রতারকের ভূমিকা পালন করেছিল। তারা নিজেদের হীন চক্রান্তের জাল বুনেছিল সকলের অজান্তে।

চার কুচক্রী বিভেদপন্থীদের রাজনৈতিক কর্মজীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়— দলীয় নেতা ও নেতৃত্বকে তারা কখনও মেনে নিতে পারেনি। দুর্নীতি, ক্ষমতা লিপ্সা, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যাভিচার ও উচ্চবিলাসই ছিল বেই- মানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যার কারণে তারা অবাস্তব ও অবান্তর স্বপ্ন দেখেছিল যে দলীয় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ঢালাও বৈদেশিক সাহায্যে দ্রুত নিষ্পত্তি সাধন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সুরতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। তদুদ্দেশ্যেই ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সনের বিশ্বাসঘাতকতার অধ্যায় চার কুচক্রীরা সৃষ্টি করে থাকে। অবশ্য আজ বেইমানরা পার্টি থেকে সরে গিয়েও জনসাধারণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে উচ্ছিষ্টের ন্যায় আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। উচ্ছিষ্ট খাবারকে যেমনি পছন্দ করে শুধু কুকুর, শেয়াল ও শকুন তেমনি জাতির এই চক্রান্তকারী বিভেদপন্থীদের পছন্দ করে শুধু তারাই যারা দুশ্চরিত্র, সুবিধাবাদী, দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীল।

চার কুচক্রীরা শ্রদ্ধেয় প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কেও পশ্চাতে সংগোপনে নানা বিরূপ মন্তব্য করতে সচেষ্ট থাকতো। কখনও বলতো ধর্মভীরু, কখনও বলতো আপোষপন্থী,

কখনও বলতো একরোখা। এছাড়া বর্তমান নেতা শ্রদ্ধেয় সন্তু লারমার বিরুদ্ধেও নানা কুৎসা ও অপপ্রচার চালাতে সর্বদাই প্রয়াসী ছিল। অথচ সামনা সামনি কোন কিছু মন্তব্য করা বা কোন কথা বলার সৎসাহস তাদের ছিলনা। পক্ষান্তরে তারাই উপযুক্ত, তারাই সবজান্তা, তারাই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের অগ্রপথিক, তারাই জাতির জাগরণের অগ্রদূত বলে নির্লজ্জভাবে জাহির করতে চাইতো। পার্টির নেতৃত্বকে তারা মনে করতো পরগাছা। কতই না তিরস্কার করতো দলীয় নেতা ও নেতৃত্বকে। মুখ বিকৃত করে অভিশাপ দিত। কিন্তু সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তিধর, শান্ত ও ধীর স্থির শ্রদ্ধেয় এম. এন. লারমার বিপ্লবী সত্বা বরাবরই কামনা করতো একদিন তাদের (চক্রদের) শুভবুদ্ধির উদয় ঘটবে, আত্মসমালোচনা করে সৎপথে ফিরে আসবে। অথচ প্রয়াত নেতার এই সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতাকে বিভেদপন্থীরা মনে করতো দুর্বলতা বলে। পরিণতিতে একদিন ক্ষমতার লিপ্সায় উন্মাদ হয়ে তারা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়।

বিভেদপন্থীদের এই ষড়যন্ত্রের সূচনা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে জাতীয় সম্মেলনে বিভেদপন্থীদের হোতা প্রকাশ ও দেবেন সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অংশীদারী হওয়ার উচ্চাবিলাসের ও চক্রান্তের অভিব্যক্তি ঘটায়। কিন্তু জাতীয় সম্মেলনে একজন নেতৃস্থানীয় সদস্যের বাস্তব পরিস্থিতির উপর যুক্তিপূর্ণ পর্যালোচনামূলক ভাষণে চক্রদ্বয় কিস্তিমাত হয়ে যায়। তখন থেকেই সুবিধাভোগী, দুর্নীতিবাজ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়।একদিকে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ অন্যদিকে সামরিক ব্যর্থতার গ্লানি (যেমন চক্র গিরির ১৯৭৬ সালে বেংখ্যং অভিযানের ব্যর্থতা, ১৯৭৯ সালে চক্র পলাশের বগাপাড়া অপারেশনে লজ্জাজনক ব্যর্থতা, ১৯৮১ সালে অকাল পক্ষ চক্র দেবেনের 'টি' জোন অভিযানের ব্যর্থতা, চক্র প্রকাশের ফিল্ড কম্যান্ডারের পদ না পাওয়ার ব্যর্থতা) এদেরকে ষড়যন্ত্রের দিকে ধাবিত করে।

১৯৮০ সালের ২২শে জানুয়ারী, বর্তমান নেতা সন্তু লারমা কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলে তাঁর বীরোচিত অবদান ও সংগ্রামী উদ্যোগের ফলে পার্টি হৃত কর্মশক্তি ও উদ্যোগ ফিরে পায়। সমগ্র পার্টির মধ্যে নতুন করে প্রাণের স্পন্দন শুরু হতে থাকে। যার ফলে নতুন কর্মশক্তি ও কর্মোদ্যোগে পার্টি আরো গতিশীল ও সক্রিয় হয়ে উঠে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাধ সাধলো ঐ নিষ্কর্মা, চক্রান্তকারী বিভেদপন্থীরা যারা তাকে রাজনৈতিক বলাৎকার করে উৎখাত করতে চেয়েছিল এবং সমগ্র পার্টিতে অঙ্গহানি ঘটাতে আদাজল খেয়ে পড়েছিল। তাবৎ অবস্থা দেখে সন্তু লার্মার নেতৃত্ব তৎকালীন দলীয় নেতৃত্বে অচিরাৎ এক বৈঠকে বসে যাতে সমগ্র পার্টিতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া জোরদার করা যায়। পার্টির সর্বস্তরে এই প্রক্রিয়া শুরু হলে ক্রমেই এক প্রাণবন্ত কর্মপ্রয়াস দেখা দেয়। কিন্তু উদ্যোগহীন ও দুর্নীতিবাজরা একে অন্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ন্যাক্যামি করতে সচেষ্ট হয়ে চক্রান্তের কুন্ডলী পাকাতে থাকে। চক্রান্তের পাঁয়তারা করতে একদিন বিশ্বাসঘাতক পলাশ রথও দেখবে কলাও বেচবে এই প্রত্যাশায় চিকিৎসার অছিলা দিয়ে কেটে পড়ে। তখন ক্ষমতায় উন্মাদ গিরির হাল ছিল ধরি মাছ না ছুই পানি। তিন দফা একান্ত আলামতে গিরি ও পলাশ চক্রান্তের পথে একাত্ম হয়ে পড়ে।

১৯৮২ সাল জাতীয় সম্মেলনের পূর্বাহ্ন। চার কুচক্রীরা যথারীতি রাশভারী ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট হয় সম্মেলন কক্ষে। এক পর্যায়ে বক্তৃতা মঞ্চে উঠে বিশ্বাসঘাতক পলাশ অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ধত কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, তারা দলীয় নীতি আদর্শ ও কৌশলের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েছে। চক্র পলাশের উদ্ধতপূর্ণ ও আবেগময় ভাষণ ছিল সম্পূর্ণ প্ররোচনামূলক। যার কারণে সম্মেলনের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। জাতিবৈইমান, বিভেদপন্থীদের সেই ক্ষমতা দখলের জালিয়াতি এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, যেন একটু খানি ফু- দিলে দপ করে জ্বলে উঠবে অগ্নির লেলিহান শিখা।

অতঃপর জাতির অবিসংবাদী নেতা, সুদক্ষ কান্ডারী এম. এন. লারমা তাঁর যুগান্তকারী ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণে বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে পার্টি ও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক রূপরেখা শোনালে বিভেদপন্থীরা যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত হয়ে যায়। দলীয় সর্বময় ক্ষমতা দখলের দুরাশায় বিচলিত হলেও সেদিন মহান নেতার বাস্তব পরিস্থিতির বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের ফলে বিভেদপন্থীরা নিজেদের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ছাই চাপা দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু কিছুদিন পরেই মহারথী প্রকাশ পুনরায় সদর্পে ঘোষণা করে থাকে যে দলীয় নীতি আদর্শ তারা মানেনা। তারা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের সম্পূর্ণ বিরোধী। তারা দ্রুত নিষ্পত্তির প্রতি বিশ্বাসী। এই ভাবে ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিহাসের চাকাকে বিপরীত দিকে ঘোরাবার প্রয়াসে চক্রান্তের গোপন জালে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের নাম দেয় 'বাধী' (দ্রুত নিষ্পত্তি পন্থী), আর পার্টির নাম দেয় 'লাম্বা' (দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের বিশ্বাসী)। এতটুকু করে কি চক্রান্তকারীদের চক্রান্তের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল? না বরঞ্চ চার কুচক্রীরা ক্ষমতার লোভে ষড়যন্ত্রের বশবর্তী হয়ে শুধু গৃহযুদ্ধের অবতারণা করলো না, পরন্তু সংগ্রামের পরিবর্তে এনেছিল আপোষ, মুক্তির বদলে এনেছিল দাসত্ব, ঐক্যের বদলে এনেছিল বিভেদ, সবার উপর সৃষ্টি করেছিল জাতির ইতিহাসে জঘণ্যতম কলঙ্কময় অধ্যায় ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সাল। জুম্ম জাতির কুলাঙ্গার চার কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের ফলে হারিয়ে গেলেন জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা এম. এন. লারমা যিনি ঘুনেধরা সামন্ত সমাজে জাগরণের ও আন্দোলনের বীজ বপন করেছিলেন আর ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন জাতিকে জাগিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। ক্ষমতা ও মন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়েও যিনি মোহিত হননি বরঞ্চ নির্ভীকচিত্তে বলেছিলেন, 'না আমি সাড়ে ছ'লক্ষ জুম্ম জনগণের সাথে বেইমানী করতে পারবো না।' সেই মহান নেতা এম. এন. লারমাকে

দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে চার কুচক্রীরা নৃশংসভাবে হত্যা করলো। এই জঘন্য দুষ্ট কীটেরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে চূড়ান্তভাবে নিক্ষিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এরা দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতেই থাকবে।

চার কুচক্রী বিভেদপন্থীদের এই হীন ষড়যন্ত্র কি জুম্ম জনসাধারণ তথা কর্মী বাহিনীকে আশ্বস্ত করতে পেরেছিল? না, পারেনি। বিপরীতভাবে যতই তাদের ষড়যন্ত্র তীব্র হয়ে উঠেছিল ততই তারা তাদের হীন মুখোশ প্রতিফলিত করেছিল। জুম্ম জনগণ ও কর্মী বাহিনী তাদের চিনে নিতে বাকী থাকেনি। দিন দিন তাদের সমর্থন কমতে থাকে। ফলে এদের থাকার মত জায়গাও সংকুচিত হয়ে পড়ে। পরিণতিতে কোন গত্যন্তর না দেখে চার কুচক্রীরা শেষ পর্যন্ত নির্লজ্জভাবে নিজেদেরকে শত্রুর কাছে বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়। বাংলার ইতিহাসে আমরা যেমনি দেখি সেই মীরজাফরদের তেমনি দেখি জুম্ম জাতির ইতিহাসে গিরি- প্রকাশ- দেবেন- পলাশদের। এরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এদের কর্মনীতি হলো—ষড়যন্ত্র করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা, জাতির সর্বনাশ ডেকে আনা আর সর্বশেষে শত্রুর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে গা বাঁচানো। তাইতো আজও চার কুচক্রীর অন্যতম দোসর এম. এন. লারমার হত্যাকারী শান্তিময় চাকমা (জয়েস) ও সুদর্শী চাকমা (শুভেন)রা সরকারের সাথে দালালি করে জনসংহতি সমিতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করছে। ইহা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুক্তিকামী জুম্ম জনগণ চার কুচক্রী বিভেদপন্থীদের কখনও ক্ষমা করবে না।

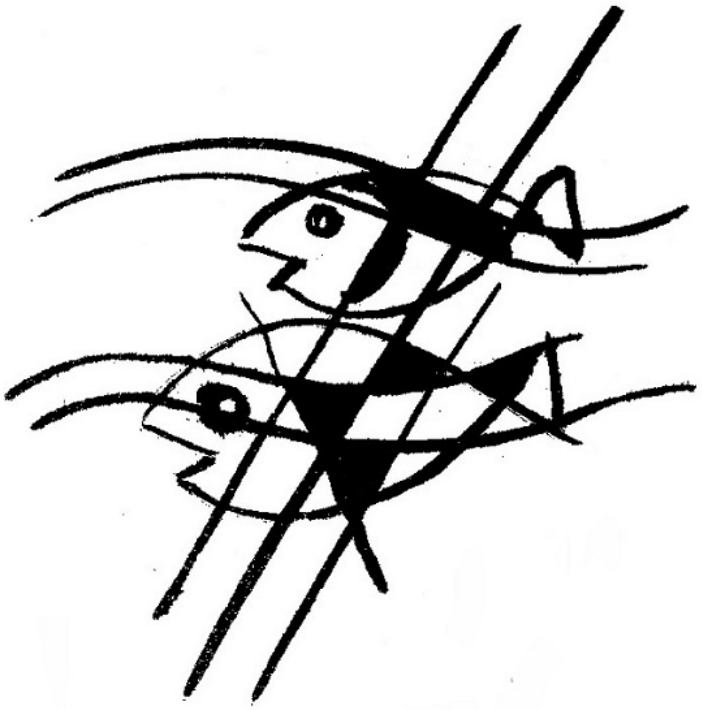

অনুভূতি

● শ্রী ধনেশ্বর

হে মহান! আজ তুমি শুধু স্মৃতি বাহুর চেতনা
দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতির গৌরব
সংগ্রামী মশাল আর
শহীদের রক্তে ভেজা মুক্তির নিশান।
হে কর্মবীর! আজ তুমি শুধু প্রেরণা গতিময় দিশা
নিপীড়িত জুম্ম জাতির পথ প্রদর্শক
বিপ্লবের সুদীর্ঘ পদযাত্রা আর
রক্তঝরা বেদনা ও শপথের অসংখ্য মিছিল।
হে বিরাট! আজ তুমি শুধু সশস্ত্র সংগ্রাম নির্মম বাস্তবতা
শোষিত বঞ্চিত মানবতার মুক্তির দিশারী
বন্দুকের আওয়াজ বারুদের গন্ধ আর
মুক্তিকামী জুম্ম জাতির সংগ্রামী প্রত্যয়ের এক সুগভীর অনুভূতি।

খগেনের স্মৃতি

● শ্রীমুকুল

শহীদ খগেনের আসল নাম খগেন্দ্র লাল চাকমা। রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার অন্তর্গত দুরছড়ি নামক গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ছোট। অর্থিক টানাপোড়নে লেখা পড়া বেশীদূর সম্ভব হয়নি। গ্রামের পাঠশালাতেই লেখাপড়ার সমাপ্তি টানতে হয়। তবে ছাত্র হিসেবে তিনি বেশ মেধা সম্পন্ন ছিলেন। বাল্যকাল হতে তিনি সাহসী, কর্মঠ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। গ্রামের উন্নয়ন কর্মকান্ডে তিনি নিজের সত্বাকে উজাড় করে বিলিয়ে দিতেন। সেই সব গুণাবলী ও চরিত্রের কারণেই পরবর্তীকালে একজন সাচ্চা সংগ্রামী হয়ে উঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

১৯৭১ সাল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামীলীগের নেতত্বে মুক্তি সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আহ্বানে হাজার হাজার মানুষ মুক্তি যুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। পাকিস্তানী সেনাদের ঠেকানোর জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে তৎকালীন পাকিস্তানের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও যুব সমাজ কাঁধে কাধ মিলিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। খগেন তখন তারুণ্যে প্রাণ চঞ্চল। মনে মনে তিনিও সিদ্ধান্ত নেন মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়ে পাকিস্তানী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার কাজে ভূমিকা রাখবেন। তাঁর সেই মহৎ সিদ্ধান্ত কিন্তু মনেই রয়ে গেল। মুক্তি বাহিনীতে নাম নথিভুক্ত করতে গেলে তাঁকে কোন এক অজ্ঞাত কারণে নেয়া হয়নি। বরং শুনতে হলো বিজাতীয় ঠাট্টা ও বিদ্রুপাত্মক কয়েকটি বাক্য। মুক্তি বাহিনীতে যোগদান করা সম্ভব না হলেও খগেন কিন্তু বিদ্রুপাত্মক বাক্যগুলো মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর অন্তরে জেগে উঠে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষোভ। অবশেষে পরিস্থিতির কারণে খগেন ভর্তি হয় সি. এ. এফ. এ, যে বাহিনী পাকিস্তানী সেনা বাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র পৃথিবীর মানচিত্রে সৃষ্টি হলে খগেন কোন রকমে বাড়ী পালিয়ে আসেন। বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রে সংবিধান রচিত হলো। বাংলাদেশে বসবাসকারী সবাই বাঙালী সংবিধানের এই ধারাকে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামে থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, মহান নেতা প্রয়াত এম, এন, লারমা মেনে নিতে পারেননি। বারবার তিনি আইন পরিষদে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্বশাসনের দাবী তুলে ধরেন। কিন্তু শুধু অরণ্যরোদন ছাড়া কিছুই হয়নি সেদিন। উগ্র-বাঙালী জাতীয়তাবাদের জোয়ারে সে সময় সমগ্র বাংলাদেশ ছিল প্লাবিত। তাই সমগ্র জুম্ম জাতিকে পাকিস্তানী হিসেবে অপব্যাখ্যা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙালী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র আইন পরিষদের ভিতরে ও বাইরে চলতে থাকে। প্রয়াত নেতা এম এন লারমা দূরদর্শী রাজনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার পাওয়া যাবে না। জুম্ম জনগণের জাতিগত অস্তিত্ব বিলুপ্তির হীন ষড়যন্ত্র বানচাল করা যাবে না। তাই অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ অবলম্বন করতে হবে। তারপর শুরু হলো পাক সেনাদের ফেলে যাওয়া হাতিয়ার ও গোলাবারুদ সংগ্রহের পালা। খগেনও সুযোগ পেয়ে যান। সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে সবাইকে তখন অনেক কষ্ট ও ধকল সইতে হয়। দলীয় স্বার্থে খগেনকে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়। তিনি খুব পরিশ্রমী, কষ্ট সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল ছিলেন। স্বল্প শিক্ষিত হলেও তাঁর বুঝার ক্ষমতা ছিল প্রখর। এজন্য পরবর্তীতে কখনো তাঁকে হতাশ হতে দেখা যায়নি।

খগেনের পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে মাঝে মাঝে অর্ধাহারে থাকতে হতো। বাড়ীর কোন দুঃসংবাদ কোন সময়েই হতাশাগ্রস্থ করেনি। বাস্তবতাকে তিনি সহজে মেনে নিতে পারতেন। তাঁদের পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাঁর বড় ভাইয়ের উপর। তাই পরিবারে ভরণ পোষণ তাঁর একার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। কঠোর পরিশ্রম ও মানসিক চাপ বেশী পড়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁর বড় ভাইও রোগাক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। বড় ভাইয়ের অকাল মৃত্যু খগেনকে সামান্য বিচলিত করে তোলে। তবুও তিনি দেশ ও দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। ভাইয়ের এই অকাল মৃত্যুতে বাড়ীতে গিয়ে বৃদ্ধ মা-বাবা, স্বামী হারা বৌদি ও পিতৃ হারা ভাইপো ভাইঝিদের দেখার প্রবল বাসনা থাকা সত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হয়নি। সে সময় খগেন বিশেষ কোম্পানীর একজন প্লাটুন কম্যান্ডার। ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ না পৌঁছার আগেই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মাফিক তাঁর কোম্পানীকে ২নং সেক্টরে ডেপুটেশন দেওয়ায় তাঁকেও সেখানে চলে যেতে হলো। পরে মৃত্যুর খবর পেয়ে তার মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয় ডেপুটেশন শেষ হলে তিনি বাড়ী যাবেন। ডেপুটেশনে যাবার আগে অবশ্য তিনি তাঁর বৌদি ও বাবা-মাকে সান্ত নাসূচক একখানা চিঠি লিখে যান। কি তাঁর নিখাদ দেশপ্রেম, আনুগত্যতা ও শৃখলাবোধ। সত্যিই সংগ্রামী বলতে যাদেরকে বোঝায় তাদের মধ্যে খগেনই ছিলেন একজন। বলাবাহুল্য যিনি দলীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যকে প্রধান মনে করে ভাইয়ের অকাল মৃত্যু তথা ব্যক্তিগত বিষয়কে উপেক্ষা করতে সক্ষম সেইতো প্রকৃতপক্ষে একজন সংগ্রামী।

যথারীতি কেন্দ্রের প্ররিকল্পনা মাফিক বিশেষ কোম্পানীকে ডেপুটেশনে বের হতে হর্ল। ১৯৭৮ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। ২নং সেক্টরে পৌঁছে সেক্টর কম্যান্ডরের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ করে কাজের সুবিধার্থে কোম্পানীকে আরো দু'ভাগে ভাগ হতে হলো। একভাগে আমরা চলে

গেলাম ১নং সেক্টরে। সে সময় ২নং সেক্টরের সেক্টর কম্যান্ডার ছিলেন মেজর সমিরণ। বিশেষ কোম্পানীকে ডেপুটেশন দেয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল শত্রু বাহিনীর উপর আক্রমণ চালানো, নূতন কর্মী ভর্তি এবং সামরিক এ্যাকশনের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করা ইত্যাদি। সেক্টর কম্যান্ডারের সাথে বৈঠক করার পর স্থির হয় যে, প্রথমতঃ যে সমস্ত জায়গায় সামরিক আঘাত হানা যাবে সে সমস্ত জায়গা নির্বাচন করা এবং কোম্পানী সদস্যদের ঐসব জায়গার ধারণা লওয়া যাবে এ্যাকশন করতে সুবিধা হয়। সেক্টর কম্যান্ডারের পরামর্শ মোতাবেক এ্যাকশনের পরবর্তী পরিস্থিতি হিসেব করে খাদ্য মজুদ করাও আরম্ভ হলো। পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত। ইতিমধ্যে শত্রু বাহিনী আমাদের কোম্পানী গ্রুপের অবস্থানের খবর তাদের গুপ্তচরের মাধ্যমে জেনে ফেলে। সুযোগ পেলে তারাও আচমকা আঘাত হানতে দেরী করছে না। তাই ইতিমধ্যে আমাদের কালেক্শন দলের সাথে দু'একটা বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষও হয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য ক্ষতি তাদেরকে করা সম্ভব না হলেও তুলনামূলকভাবে আমরা লাভবান হয়েছি বেশী। কারণ তখন জনগণের উপর শত্রুর দমন পীড়নের মাত্রা অত্যাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে জনগণ অসন্তুষ্ট ও আত্মসচেতেন হয়ে উঠতে থাকে। ফলশ্রুতিতে জনগণের তরফ থেকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চাপ আসতে থাকে। আমাদের পক্ষের সামরিক পরিকল্পনা তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। বাকী শুধুমাত্র বাস্তাবায়ন করা। বাস্তবায়ন করতে গেলে আমাদের বুদ্ধি ও কৌশলের উপর বেশী জোর দিতে হয়। কারণ আমাদের তুলনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অধিকতর শক্তিশালী। তাই ছলনা ও প্রতারণা ইত্যাদি দিয়ে তাদেরকে আমাদের ঠকাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বড় দলটাকে গোপনে রেখে দু'তিনটা ছোট দলকে বাইরে ঘোরাফেরা করতে দেয়া হলো। এই ছোট ছোট দলগুলোর উপর দায়িত্ব ছিল শত্রুর তথ্য সংগ্রহ করা। আমাদের কুরিয়ারের মাধ্যমে খবর আসলো—লংগদু তিনটিলা ক্যাম্প থেকে ১১ ই বি আর-এর ৩৫ জনের একটা সেনাদল ডানে আটরকছড়া হয়ে মৌন এলাকায় অপারেশনে বের হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র সব যোদ্ধাদের ফল ইন করা হলো। আক্রমণের মূল দায়িত্বে থাকবেন মেজর সমিরন নিজেই। ব্রিফিং এর মাধ্যমে কার কি কাজ বুঝিয়ে দেয়া হলো। প্রথম আক্রমণ করবে লেফটেন্যান্ট খগেনের দল। পর্যবেক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে খবর পাওয়া গেলো শত্রুরা ফিরে আসছে। খবর পেয়েই তড়িঘড়ি করে আমরা যে যার পজিশনে গিয়ে ওৎপেতে রইলাম। ঘড়িতে তখন পৌনে চারটা। কম্যান্ডারের নির্দেশ মোতাবেক ব্রাশ ফায়ার হলো খগেনের দল থেকে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। একটানা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মত চললো সংঘর্ষ। সেদিন ছিল ২১ শে জুন ১৯৭৯ ইংরেজী। দুপুরে সামান্য বৃষ্টি হওয়াতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আকাশটা দেখে মনে হয়েছিল যেন বর্ষার পরে শরতের আগমণ ঘটেছে। আমরা প্রথম উইথড্র হয়ে আর ভি-তে চলে আসি। কম্যান্ডার রিপোর্ট নিতে থাকেন। যার যার গ্রুপের রিপোর্ট দেওয়া হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট খগেন, সার্জেন্ট সংগ্রাম, লেন্স কর্পোরেল প্রয়ণ, ডাক্তার কিরণ ও আঞ্চলিক কর্মী শান্তিকে পাওয়া যাচ্ছিল না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল খগেনদের পূর্বদিকে উইথড্র হতে দেখা গেছে। এই কথায় সন্তুষ্ট হয়ে আমরা নিরাপদ জায়গায় চলে আসি। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে সবাই কোন রকমে রাত কাটালাম। সকাল হলে খগেনদের খোঁজে লোক নিয়োগ করা হলো। অপরদিকে লংগদু হতে রিইমফোর্সমেন্ট এসে ঘটনাস্থল ঘেরাও করে রেখেছে শত্রু বাহিনী। পাবলিক সোর্সের মাধ্যমে জানা গেল লেফটেন্যান্ট খগেনরা ঘটনাস্থলেই শত্রুর গুলিতে নিহত হয়েছে। এই তথ্য পেয়ে আমরা কিছুটা অবাক হলাম। কিন্তু শেষাবধি জানা গেল যে শত্রুবাহিনী ফিরে যাবার সময় একজন জুম্মকে এসকর্ট হিসেবে তাদের আগে আগে চলতে বাধ্য করছিল। ঐ পাবলিকের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়েই তাদের এই পরিণতি। সার্জেন্ট সংগ্রাম বারবার অর্ডার চেয়েছিল পাবলিকটাসহ শত্রুদের আক্রমণ করে সরে যেতে। কিন্তু খগেন অনুমতি দেয়নি। ফলে পাবলিকের সাথে শত্রু ক্যাপ্টেন রিয়াজ উদ্দীন এ্যাম্বুশ এরিয়ার বাইরে যেতে সমর্থ হয় এবং পেছন থেকে তাদের চারজনের উপর ব্রাশ ফায়ার করে। ফলে তারা পাঁচ জনই শহীদ হন। সেদিনের যুদ্ধে শত্রু পক্ষের কমপক্ষে ২৫ জন হতাহত এবং আমরা শত্রুর অনেকগুলো হাতিয়ার দখল করতে সক্ষম হলেও এই দুঃসংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথেই সবাই মলিন মুখে বসে পড়ে। কারও পেটে তখনও ভাত নেই। বিষণ্ণবদনে অনেকেই বলাবলি করছে সত্যি মানুষটা কত দয়ালু। সাধারণ এক লোককে বাঁচাতে গিয়ে তাকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হলো আরও চার কর্মী বন্ধুর সাথে।

সত্যি লেফটেন্যান্ট খগেন একজন ত্যাগী, দয়ালু, সাহসী বীর যোদ্ধা। তার আশা ছিল ডেপুটেশন শেষ করে বৃদ্ধ পিতা, মাতা, স্বামীহারা বৌদি এবং পিতৃহারা ভাইপো-ভাইঝিদের দেখে আসবে। কিন্তু তার সেই বাসনা বাস্তবায়িত হয়নি। কে জানতো তার সেই ডেপুটেশনই হবে জীবনের শেষ ডেপুটেশন। জীবনের সকল মায়ামোহ স্বার্থ ত্যাগ করে দেশ ও জাতির স্বার্থে যিনি জীবন উৎসর্গ করেন তিনিই তো প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও নিপীড়িত জনগণের একনিষ্ঠ বন্ধু। শহীদ খগেন ছিলেন তাদের মধ্যে একজন।

খগেন ও তার সহযোদ্ধাদের মৃত্যু সংবাদ আমাদের সবাইকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। অনুরূপ গোটা পার্টিকেও। সদা প্রাণ চঞ্চল অকুতোভয় দক্ষ কম্যান্ডার ও সংগঠক লেফটেন্যান্ট খগেনের এই অকাল মৃত্যু জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের লড়াইয়ে অসংখ্য শহীদের আত্মত্যাগের মত মহীয়ান ও অমর। খগেনের মত আত্মোৎসর্গ করে যাওয়া বীর যোদ্ধাদের স্মৃতিই নিপীড়িত জাতি ও সর্বহারা মানুষের যুগে যুগে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবে। তাদের আমরা কখনই ভুলতে পারি না। আর সে কারণেই শহীদ যোদ্ধাদের অসমাপ্ত কাজ সফলভাবে সমাপ্ত করা তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করতঃ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করণের মহান কর্মকান্ড এগিয়ে নেয়া উত্তরসুরীদেরই প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের আত্মবলিদানের ইতিহাসই উত্তরসুরীদের গর্বের ইতিহাস ও এগিয়ে চলার পাথেয়।

আপোষহীন সংগ্রামী জীবনের কিছু কথা

● শ্রীনিটো

কাঞ্চন একজন যুবকের নাম। বাংলাদেশ নামক আজকের এই ভূ-খন্ডের দক্ষিণ পূর্ব অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের মাইনী উপত্যকায় এক অখ্যাত প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার জন্মস্থান। স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ যুবকের মত তারও মানুষের মত খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন ছিল। স্বাভাবিকভাবে সেও চেয়েছিল প্রাণপ্রিয় এই জন্মভূমির সুনাগরিক হয়ে দেশের আপামর জনগণের সাথে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে। পাকিস্তানী অপশাসনের নাগপাশ থেকে এদেশকে মুক্ত করার সুমহান আন্দোলনে সাড়া দিয়ে সেও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। স্বীয় স্বার্থের জন্য এতটুকু ভাবেনি তখন। অন্য অনেক বন্ধুর মত ব্যক্তি জীবনের ভোগবিলাসী ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারেনি বলেই কঠোর বাস্তবতার মাঝেও কাজ করে যেতে ভয় পায়নি কখনও। অজস্র সফলতা ও বিফলতার মধ্যেও মানুষ কাজ করে একটা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। ব্যক্তি স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সামগ্রিক স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ হওয়া সবার পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। বস্তুতঃ তাই একজন নিঃস্বার্থ মানবতাবাদীর চাওয়া পাওয়ার সাথে এক স্বার্থপর বিত্তশালীর চাওয়া পাওয়ার মধ্যে বিশাল ফারাক। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বড় ভাই - এর একান্ত অনুরোধে কাঞ্চন ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজে পড়তে গিয়েছিল। মনে মনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কথাও ভেবেছিল নয়কি। তাই যথারীতি পড়াশুনাও চালিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবতার নির্মম পরিহাস অধ্যায়নরত অবস্থায় একসময় তাকে পড়াশুনা গুটিয়ে আসতে হয় সেই ঢাকা থেকে।

১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাস। বরাবরের মত পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্মিদের অত্যাচার চলছে। বেপরোয়া ধরপাকড় বেড়েই চলেছে তখন। সেনাবাহিনী ব্যাপক অর্থের লোভ দেখিয়ে অথবা বিপাকে ফেলে জুম্ম জনগণের মধ্য থেকে অনেককেই স্পাই, ইন্‌ফরমার নিয়োগ করেছে। এমনি নৈরাজ্যময় অবস্থায় কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই অনেক নিরাপরাধ জুম্মকে অহেতুক নির্যাতন ও আটক করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ফলতঃ সমাজের তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রবেশী সরকারী লেজুরদের গোপণ ইঙ্গিতে অন্যান্য অনেকের মত কাঞ্চনের বড় ভাই ও বাবাকে আর্মিরা ধরে নিয়ে যায়। দীঘিনালা ক্যান্টনম্যান্টের নির্যাতন কুঠুরিতে অমানুষিক অত্যাচার চালান হয় তাদের উপর। দেশের প্রচলিত আইন এখানে হাস্যকর বিষয়। কোন ওজর আপত্তি বা আবেদন নিবেদন সেনা কম্যান্ডারের কাছে অর্থহীন। অনেক চেষ্টা তদ্‌বিরের পরও যখন তারা ছাড়া পেল না তখন স্বভাবতই কাঞ্চনের লেখাপড়ার খরচ চালান সম্ভব হলনা। এমনি পরিস্থিতিতে সে ঢাকার শিক্ষা জীবন মাঝ পথে বন্ধ করে ফিরে আসলো নিজের এলাকায়। পিসতুতো ভাই-এর সহায়তায় অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে চার মাস দীঘিনালা সেনানিবাসের অন্ধকার কুঠুরিতে মানবেতর জীবন থেকে বাবাকে খালাস করিয়ে নিয়ে আসা হয়। ক্যান্টনম্যান্ট থেকে বেরিয়ে আসার ঠিক এক মাস পরই কাঞ্চনের বাবা মারা যান। অন্যদিকে বড় ভাইকে দীঘিনালা কারাগার থেকে খাগড়াছড়ি, খাগড়াছড়ি থেকে শেষ পর্যন্ত ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারে পাঠানো হয়। দীর্ঘ উনিশ মাস বিনা কারণে কারাবরণের পর বড় ভাই জামিনে মুক্তিলাভ করলেও কিন্তু ইতিমধ্যেই পারিবারিক অবস্থা চরম বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয়ে কাঞ্চনের পিছনে ফিরে তাকানোর আর সুযোগ রইলো না। দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারটির হাল ধরতে গিয়ে কাঞ্চনের শিক্ষা জীবন চিরতরে শেষ হল। এমনিতর দুঃসময়েও একদিন দীঘিনালা সেনানিবাসের ক্যাপ্টেন জামিল (যিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের সময়কালে নিহত হন) এবং সুবেদার শাহাবুদ্দীন নিজ বাড়ী থেকে কাঞ্চনকে বিনা অজুহাতে ধরে নিয়ে যায়। শুধু কাঞ্চনই নয় পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন কোন তরুণ বা যুবক সম্ভবতঃ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে সেনাবাহিনীর অত্যাচারে পড়েনি। আর্মি নির্যাতনের পর কাঞ্চন যখন ছাড়া পায় তখন থেকেই তার দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে। ক্রমাগত সামরিক নিপীড়ন সরকারী বঞ্চনা যেমন মানুষকে তিলে তিলে বিদ্রোহী করে গড়ে তুলে তেমনি শিক্ষিত জুম্ম সমাজও বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। স্বাভাবিক কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ে তীব্র হয়ে উঠা আন্দোলনে কাঞ্চনসহ অসংখ্য তরুণ সাড়া না দিয়ে পারল না। সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে মৃত্যুর হিমশীতল ভয়াবহতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আজো ওরা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের লড়াইয়ে বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে সর্বদা নিয়োজিত। মানবতাবাদকে সামনে রেখে কাঞ্চন আজো নিরলসভাবে কাজ করছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা মানেই কাঞ্চন এখন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ও অধিকার ছিনিয়ে আনার বাস্তবতাকেই বুঝে।

১৯৮০ সাল। জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণে যোগদানের জন্য ডাক এলো। একটানা তিন মাস ট্রেনিং শেষ করে যে যার পোষ্টিং-এ চলে গেল। কাঞ্চনও চলে গেল স্বীয় কর্মস্থলে। দেবাশীষ তখন কোম্পানী কম্যান্ডার। দেখতে দেখতে ১৯৮২ সালে পার্টি জাতীয় সম্মেলন এসে গিয়েছিল। দ্রুত নিষ্পত্তি ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের নীতি নিয়ে তখন মতবিরোধ দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে কিছুসংখ্যক দুর্নীতিগ্রস্থ উচ্চাবিলাসীর ও স্বার্থবাদী কতিপয় নেতৃস্থানীয় সদস্য শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর লেজুর সেজে দ্রুত নিষ্পত্তির শ্লোগান তুলে জুম্ম জাতির জাতীয় ঐক্য ও আন্দোলনকে চিরতরে বানচাল করে দিতে

চেয়েছিল। জাতীয় সম্মেলনে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে বাক-বিতন্ডা, যুক্তি, পাল্টা যুক্তি ইত্যাদির কথা শুনা যাচ্ছিল কর্মীদের মুখে মুখে। কর্মীদের নিজেদের মধ্যেও সন্দেহ, অবিশ্বাস বাসা বেঁধে উঠেছিল একে অপরের প্রতি। কাজেই সম্মেলনের আলোচনা চলছিল কিছুটা সংগোপনে। বলতে গেলে সব এরিয়া, ইউনিট বা সেক্টরে একটা চাপা সংশয় ও উত্তেজনা বিরাজ করছিল। পার্টিতে যোগ দেয়া নতুন কর্মীদের উপর বিশ্বাস বা আস্থা রাখতে পারছিলেন না সংশ্লিষ্ট কম্যান্ডাররা। স্বাভাবিকভাবে কাঞ্চনদের উপরও নির্ভরশীলতা বা বিশ্বাস কমছিল। কিছু একটা বিপর্যয় যে আসন্ন তা ক্রমেই বুঝা যাচ্ছিল। অজানা আশংকায় কাটাচ্ছিল প্রতিটি কর্মী। ষড়যন্ত্রকারী কারা বা বিভেদপন্থীদের সমর্থক কারা তা নির্ধারণ করা তখন খুবই কঠিন। একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সবাইকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এমনি পরিস্থিতিতে কোম্পানী হেড্‌কোয়ার্টারে কয়েক দফা বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, কেন্দ্রীয় বাহিনী হিসেবে কেন্দ্রকে সমর্থন ও প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা দিতে হবে। ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে কেন্দ্রিয় কার্যালয় থেকে লিখিত নির্দেশ মোতাবেক পেলে ও দেবাশীষ - এর নেতৃত্বে প্রায় ১৫০ জনের অধিক একটি সশস্ত্র দল উত্তরের দিকে রওনা দিল। পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি রিপ কাঞ্চনদের এই গ্রুপকে অভ্যর্থনা জানান। আকাশে তখন কাল বৈশাখী ঝড়ের ঘনঘটা। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই রিপ বিরাজমান পরিস্থিতির উপর সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন এবং করণীয় দায়িত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়ে স্বগন্তব্যে চলে যান।

পার্টির এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই জরুরী হয়ে পড়ায় পার্টির বর্তমান প্রথম সারির নেতারা এক জরুরী বৈঠক বসলেন। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর কিছু মৌলিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নীতিগত প্রশ্নে — সংঘর্ষই এই চূড়ান্ত সমাধানের চাবিকাঠি এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমেই এই চূড়ান্ত সমাধান করতে হবে এটি ছিল অন্যতম। পার্টি তথা গোটা আন্দোলনের ভবিষ্যত যখন বিপন্ন হচ্ছিল তখনকার এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মুখে পার্টি সঠিক সিদ্ধান্ত টানতে পেরেছে বলেই জুম্ম জাতির কুলাঙ্গার গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রদের পর্য্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। নীতিগত আরো কিছু সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল—

১) নিশ্চিতভাবে আঘাত হানার অর্থ আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা ও জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

২) নিশ্চিতভাবে আঘাত হানার অর্থ নীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে যাওয়া।

৩) নিশ্চিত ও নির্মমভাবে আঘাত হানার অর্থ হলো দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের সমূলে উৎখাত করা।

সুতরাং সংঘর্ষের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যা নিষ্পত্তির কালজয়ী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎখাত করা সম্ভব হয়েছিল।

চেঙ্গী উপত্যকার একটি নিভৃত অঞ্চল গোলকপতিমা নামক স্থানে চক্রান্তকারীদের সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মুখোমুখী হয় ১৪ই জুন ১৯৮৩ সনে। চার কুচক্রীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে কেন্দ্রিয় বাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। চার ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে চক্রান্তকারীদের পরাস্ত করা হয়। তারপর খন্ড যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। "নীতি আদর্শ বাঁচলে পার্টি বাঁচবে - বাঁচবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন আর আন্দোলন বেঁচে থাকলে দেশ জাতও বাঁচবে" — এই ছিল তখনকার সময়ে মৌলিক শ্লোগান। সকল ষড়যন্ত্রের হোতাদের নির্মূল করতে তখন আঘাতের পর আঘাত পরিচালনা করা হচ্ছিল। বিশ্বাসঘাতকরা সমূহ পরাজয়ের অবস্থা বুঝে শেষ পর্যন্ত অনাক্রমণ চুক্তি করে বসে। "ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া" নীতির ভিত্তিতে বিভেদপন্থী ও ষড়যন্ত্রকারীরা পার্টির সাথে আপোষ করার প্রস্তাব উত্থাপন করে থাকে। তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে ভেবে পার্টিও বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অনাক্রমণ চুক্তিতে যেতে সতর্ক সম্মতি জানায়। ফলে উদ্ভূত সংকট নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আলোচনার মাধ্যমে বিবাদমান জটিলতার অবসান এবং প্রকৃত সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করা জরুরী বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ লক্ষ্যে পার্টির পক্ষ থেকে রিপ - এর নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল মুখোমুখী আলোচনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নিরাপত্তার বিষয়টি তদারকির জন্য কাঞ্চনের প্লাটুনও নিয়োগ করা হয়। কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের পূর্বদিকের উঁচু টিলার উপর তারা অবস্থান নিয়েছিল যাতে যেকোন অবস্থায় শত্রুর আক্রমণ থেকে কেন্দ্রকে রক্ষা করা যায় এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা যায়। প্রস্তুতি প্রায় শেষ। যাত্রার পূর্ব মুহূর্ত। বরাবরের মত শ্রদ্ধেয় নেতা এম এন লারমা ধীর পায়ে বাইরে এসে ব্রিফিং দিতে দাঁড়ালেন। সেদিন কেউ ভাবতে পারেনি যে —এটাই তাদের উদ্দেশ্যে নেতার শেষ বক্তব্য। তথা জনগণ ও গোটা বিশ্ববাসীরও। তারিখটি ছিল ১৯৮৩ সালের ৬ই নভেম্বর। শ্রদ্ধেয় নেতা বললেন— "ধৈর্য্যশীল হওয়ার গুণ, মনোবলের অধিকারী হওয়ার গুণও ক্ষমাশীল হওয়ার গুণ প্রতিটি সদস্যের থাকা বাঞ্চনীয়। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের বিশ্বাসী হয়ে আন্দোলনকে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে ধাবিত করার লক্ষ্যে অসীম মনোবলের গুণ অর্জন করা প্রত্যেকের একান্তই জরুরী"— এভাবে তিনি কাঞ্চনদের উপদেশমূলক সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা বলে বক্তব্য শেষ করেন। তার গলার স্বর বেশ গম্ভীর মনে হচ্ছিল। যদিও বেশ কদিন ধরে তিনি শারিরীকভাবে সুস্থ ছিলেন না। তবুও মনে হচ্ছিল তিনি বেশ ধীরস্থির, প্রাণবন্ত এবং আশাবাদী। ব্রিফিং শেষ হলে পর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডস্যাক পর্ব অর্থাৎ বিদায় মুহূর্ত এসে গেল। কোন কোন বিদায় সাময়িক মনে হলেও মৃত্যুর মত। মৃত্যু যেমন চিরকালের জন্য বিদায় ঠিক তেমনি এখানেও তার কোন ব্যতিক্রম নয়— এ মৃত্যু চিরদিনের ও চিরজীবনের। এ যাত্রার পর কাঞ্চনরা আর শ্রদ্ধেয় নেতা এম এন লারমাকে কাছে বসে পরিস্থিতি সম্পর্কে ও জনগণের খবরাখবর জানাতে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে, আন্দোলন জয়যুক্ত হওয়ার বিষয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলতে বা শুনতে আর দেখেনি। গিরি -প্রকাশ চক্র চিরতরে তার কণ্ঠরোধ করে দিয়ে আন্দোলনকে এক সন্ধিক্ষণে এনে দিয়েছিল। তবুও জাতীয় নেতার এ মৃত্যুর কোন মরণ নেই, নেই কোন পরাজয়—এ মৃত্যু চিরভাস্বর

ও অপরাজিত।

আলোচনার জন্য নির্ধারিত প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন – রিপ, দেবং শী, মুকুল ও আশীষ। বিরোধিতার কারণে বিশ্বাসের দেয়ালে খানিকটা ফাটল ধরলেও প্রতিনিধি দলটি বিভেদপন্থীদের থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলবে বলেই আশা করেছিল। পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্যার একটা সুরাহা করে অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে অধিকতর গতিশীল করা যাবে এটাই ছিল সবার একান্ত প্রত্যাশা। সকল প্রকার শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মারমুখো আক্রমণ পরিচালনার মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের সংগ্রামকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হবে এটাই সবার একান্ত কামনা ছিল সেদিন। কিন্তু বৈঠকের নামে ষড়যন্ত্রের যে নীলনক্সা বিভেদপন্থীরা তৈরী করে রেখেছিল তা সে দিন কেউ কল্পনা করতে পারেনি। ছলচাতুরির মাত্রা যে কত বীভৎস, ভাওতাবাজীর ধরণ যে কত ঘৃণ্য তাই অবশেষে ১৯৮৩ সালে ১০ই নভেম্বর মহান নেতা এম এন লারমাসহ আরো আটজন সংগ্রামী বন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যা করার মধ্যদিয়ে চার কুচক্রীরা প্রমাণ করে দিয়েছিল।

১০ই নভেম্বরের হৃদয়বিদারক ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতি খুবই সংকটের মধ্যে দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে। পার্টি সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। সাংগঠনিক, রাজনৈতিক এমনকি আর্থিক দিক থেকেও পার্টির তখন চরম বিপর্যস্ত। এই বিধ্বস্ত অবস্থায় একজন যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতার নেতৃত্বে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার লক্ষ্যে ১৯শে নভেম্বর '৮৩ সর্বসম্মতিক্রমে বর্তমান পার্টির সভাপতি সন্তু লারমাকে পার্টি অস্থায়ী সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সেদিন প্রথমেই গৃহযুদ্ধকে অতিদ্রুত শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করেন। মলয়কে প্রথম ও পেলেকে দ্বিতীয় কম্যান্ডারের দায়িত্ব দিয়ে ডি ডি এফ (DISSIDENT DESTRUCTION FORCE) গঠন করা হয়। চক্রান্তকারীদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য ১ নং ও ২ নং সেক্টরে দেবাশীষ এবং ৩নং, ৪নং ও ৫নং সেক্টরের দিকে রিপকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। পরিকল্পনামাফিক চক্রান্তকারীদের উপর আঘাত হানার কাজ দ্রুতগতিতে চলতে থাকে।

খুব অল্প সংখ্যক সঙ্গী নিয়ে কাঞ্চন বর্তমান সভাপতি -এর সাথে গোপণ আস্তানায় অবস্থান নিয়েছিল তখন। নির্দিষ্ট কোন একটি জায়গায় তারা এক রাত্রির অধিক অবস্থান করতো না। নির্দিষ্ট কয়েকজন লোক মাত্র তাদের সাথে দেখা করতে যেতে পারতো এবং তারাই বাহিরের যাবতীয় খবরাদি নিয়ে আসতো। কোন ভাল খবর থাকলে তৎক্ষণাৎ স্যার কাঞ্চনদের জানাতেন এবং খুশীতে হাসাহাসি ও করমর্দন করতেন পরস্পরের সাথে। তা দেখে মনে হত যেন গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে আমরা সেই হারানো নেতৃত্বের অবস্থায় বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছি। কিন্তু কোন খারাপ খবর আসলে শুধু বলতেন কি করার আছে, রক্ত না দিলে আমরা কোনদিন অধিকার ফিরে পাবো না, জয়যুক্ত হতে পারবো না। যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করবো ততটুকুই আমরা কাজের ফসল হিসেবে পাবো, এই রক্ত পিচ্ছিল সংগ্রামে এসব দেখে ঘাবড়িয়ে গেলে চলবে না। আমাদের সামনে এগিয়ে চলার নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি প্রায়ই বলতেন সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে যদি আমরা গৃহযুদ্ধ শেষ করে যেতে না পারি, যদি আমরা জনগণের ইচ্ছা পূরণ করে দিতে না পারি তাহলে জনগণ আমাদের ক্ষমা করবে না। জনগণের সাথে ছিনিমিনি খেলার কোন অধিকার নেই -- প্রায় সময়ই এই কথাগুলি তিনি বলতেন। সঠিক সমাধানের একটা সূত্র সবসময় বের করে আনার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করতেন।

পরিকল্পানামাফিক আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চক্রান্তকারীদের সমূলে বিনষ্ট করতে না পারলেও তাদের কার্যকরী শক্তিকে অচল ও অকেজো করে দেয়া গেছে অনেক রক্তপাত ও ত্যাগ-তিতিক্ষার পর। গৃহযুদ্ধে জাতি হারিয়েছে পার্টি ও শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, মেহনতি মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু ও জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত অবিসংবাদিত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে, শহীদ হয়েছেন অনেক সহযোদ্ধা। জাতির এ অভাব কোনদিন পূরণ হবে না। দেশ ও জাতির এ আত্মত্যাগের কোন তুলনা নেই। এই ত্যাগ তাদের করেছে অমর। তারা ছিল জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে আপোষহীন সংগ্রামী, জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঘুণেধরা সমাজের সকল আবর্জনা মুছে ফেলে নতুন জুম্ম সমাজ গঠনে তারাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল । তাই বর্তমান প্রজন্মের কাছে যেমন পূজনীয় তেমনী ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছেও হবে স্মরণীয়। তাদের আত্মবলিদান বৃথা যাবে না। জুম্ম জাতির ইতিহাসে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মহান নেতা এম এন লারমা আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার প্রদর্শিত ও অনুসৃত নীতি আদর্শ আমাদের এগিয়ে চলার মোক্ষম হাতিয়ার। তিনি শুধু জুম্ম জাতির গৌরব নন, গৌরব বিশ্ব মেহনতি মানুষ ও চির অবহেলিত ও বঞ্চিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহেরও। আজীবন তিনি তার সর্বস্ব ত্যাগ করে দুঃখী মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ভয়ভীতিহীনভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে গিয়েছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির কাছে কোন দিন মাথানত করেননি, আপোষ করেননি প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয় বেইমান গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের সাথে। আহত অবস্থায় পেয়েও চক্রান্তকারীরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে তিনি নির্ভয়ে হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন– "আমাকে মেরে তোমরা যদি দেশ তথা জাতির অধিকার আনতে পার এবং বিশ্বের মেহনতি মানুষদের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে যেতে পার তাহলে আমার মরণই হবে পবিত্র এবং আমার জীবনের চরম পাওয়া।"

আমরা ন্যায় যুদ্ধে জড়িত পক্ষান্তরে বাংলাদেশ সরকার অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত। বাস্তব জীবনে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। সুতরাং বাস্তবতার মধ্য দিয়েই আমাদের অগ্রযাত্রা তথা জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। তাই সর্বপ্রকারের হীন প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়েই জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ, ভূমি অধিকার পূনঃপ্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক শাসন কায়েমের

ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি শেষ পর্যন্ত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন চালিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা কোনদিন পিছপা হবো না, আমরা আজো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সুসংহত। প্রয়াত নেতার অবদান ও স্মৃতি আমাদের সদা উজ্জীবিত রেখে এগিয়ে নেবে। শুধু জুম্ম জাতিকে নয়, বিশ্বের নিপীড়িত জাতি মেহনতি মানুষকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে চিরদিন প্রেরণা ও সাহস যোগাবে। সবশেষে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১১২ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে কাঞ্চনের মত সকল জুম্ম মেহনতি ও নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রাম হোক আজকে সবাইয়ের অঙ্গীকার।

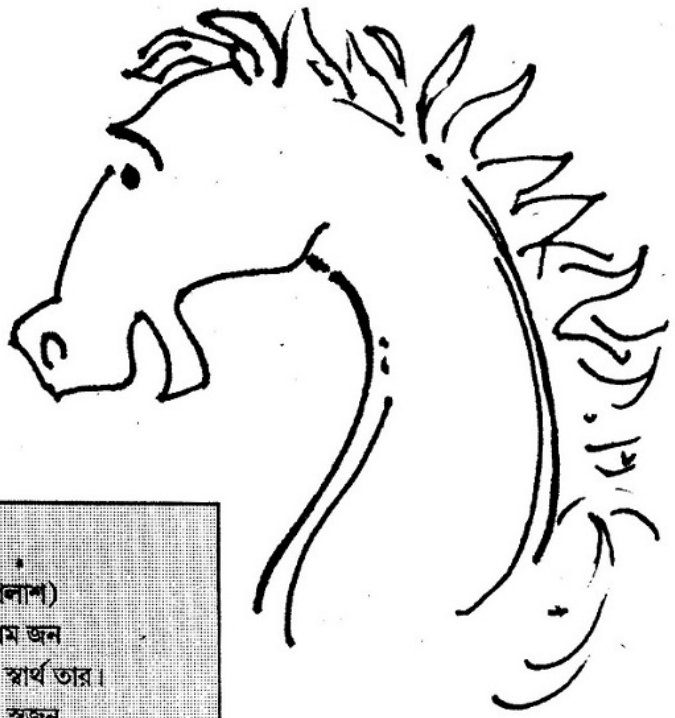

চার কুচক্রী

(গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ)

জাতির কলঙ্ক পাপী, মানুষ অধম জন
বুঝেনা নির্বোধ মূর্খ, কিবা রহে স্বার্থ তার।
জাতি শত্রু নরাধম, বধি আপন স্বজন
লভে সে অশুভ গতি, চির যুগ যুগান্তর।।

তাদের স্মরণে

● শ্রী কিশোর

দিয়াছ পথের সন্ধান–
হে জাতির বন্ধুবৃন্দ, উদার মহান।
জাতির দুর্দিনে সবে করি উদাত্ত আহ্বান –
অভয় মন্ত্রে করিলে জাতির জীবন বোধন,
জাগালে জাতির দানি মানবতা দৃপ্ত জীবন,
লভিল জাতি বীর্য্য বিভব, মন্ত্রে শংকা হরণ।
লভিল জাতি তার জীবন পথের সন্ধান,
লভিল জাতি বিশ্ব সভায় জাতির সম্মান।
মানবতায় মানুষেরে করিয়া বিজয়,
বিশ্ব মানবে করিলে জয়,
হাসিমুখে আপনারে করি দান হে! মহান
অমরতায় লভিলে বিজয়
হে। উদার মহান, আপন জীবন দানে
করিলে জাতির জীবন বোধন
জাতির মঙ্গলে সবে করি প্রাণ দান
দিলে সবে বিশ্বে মহা অবদান।

দুলা গোষ্ঠী ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

● শ্রীজগদীশ

জুম্ম জনগণের বর্তমান সামাজিক পরিমন্ডলে তথা জুম্ম সমাজে "দুলা" শব্দটি আজ এক রাজনৈতিক পরিভাষায় রূপ লাভ করেছে। বর্তমানে এই শব্দটি এক বিশেষ অর্থে এক বিশেষ শ্রেণীর পরিচয় হয়ে উঠছে। জুম্ম জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যারা প্রতিক্রিয়াশীল, আপোষকামী, সুবিধাবাদী ও দালাল তাদের প্রত্যেককে দুলা আর সমষ্টিগতভাবে (শ্রেণীগতভাবে) দুলা গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে আসছে।

মূলতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিধাবাদীদের বুঝাতে বিস্তৃতি ঘটেছে। দুলা শব্দটি হল একটি চাক্‌মা (ভাষা) শব্দ। চাক্‌মা ভাষায় দুলা বলতে ছোট মাছ, কাঁকড়া, শামুক ইত্যাদি রাখার ও বহনের জন্য বাঁশের বেতীর তৈরী ছোট গলা বিশিষ্ট এক প্রকার ঝুড়িকে বোঝায়। আর এই দুলা বহনের জন্য অন্য একজন সহযোগীও থাকতে পারে। তাকে বলা হয় দুলা ধয্যা। এই দুলা ধয্যা (দুলা বহনকারী) সংক্ষেপে "দুলা" তেমন কোন পরিশ্রম ব্যতিরেকেই সংগৃহীত বস্তুর একটা অংশ সচরাচর ভোগ করে থাকে। জুম্ম সমাজেও এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা দুলার (দুলা ধয্যা) ন্যায় বিনা পরিশ্রমে প্রতিক্রিয়া করে অথবা আপোষের মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে। এরা জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থকে চরিতার্থ করতে কোন দ্বিধাবোধ করে না। এ কারণে অনেকটা মুৎসুদ্দি চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিকেই দুলা আখ্যা দেয়া যেতে পারে। দুলাদের চরিত্র হচ্ছে এই -- তারা চায় আন্দোলনের বিপরীতে আপোষ, সংগ্রামের বিপরীতে সমঝোতা, বিপ্লবের বিপরীতে বশ্যতা, কঠোরতার বিপরীতে নমনীয়তা আর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বিপরীতে দালালী ও আনুগত্যতা। অধিকারের দাবী নিয়ে রাজপথে যখন জনতার ঢল নামে তখন দুলারা শয়নকক্ষে ঘুমোয়, হাতে অস্ত্র নেয়ার পরিবর্তে তারা সাদা পতাকা তুলে নেয়, অজানা আশংকায় জানালায় উঁকি দেয় ও অহেতুক উত্তেজনায় তারা মাতাল হয়। আত্মরক্ষা ও আত্মসর্বোচ্চিতাই হচ্ছে তাদের সর্বশেষ লক্ষ্য। তাই সর্বপ্রকার সুবিধা গ্রহণে তারা সদা তৎপর । তারা সরকারী মিটিং-এ উপস্থিত থেকে আনুগত্যতা ও প্রশান্তবাদীতা প্রকাশ করে থাকে। শাসক শোষক গোষ্ঠীর বুলি আউড়িয়ে নিজের দুলা বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করে। আর সরকারী প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট যেমন -- চাল-গমের রিলিফ, গাছ-বাঁশের পারমিট, উৎকোচ, চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে নিজের উদর পূর্ণ ও পরিবারে ভরণপোষণ করে এবং শাসক-শোষক গোষ্ঠীর প্রতি অনুগত থেকে তথাকথিত সম্মানিত ও মহৎ জীবন যাপন করে থাকে। তবে তারা নিজেদেরকে সাচ্চা দেশপ্রেমিক ভাবে। এমন আচরণ করে থাকে যেন দেশ ও জাতিকে তারাই শুধু ভালবাসে। অথবা তারা চায় মখমলের গদিতে বসে দেশের সেবা করতে, সুগন্ধময় ও শোভামন্ডিত কক্ষে বসে দেশের চিন্তা করতে। তারা জাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে অনেক প্রজেক্ট তৈরী করে আর জাতির উন্নয়নের নামে এসব প্রজেক্ট মুখ্যতঃ নিজেদের পাকা বাড়ী, গাড়ী, ব্যাংক ব্যালেন্স, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি কিভাবে অর্জন করা যেতে পারে তা বুঝিয়ে থাকে।

দুলাদের দেশপ্রেমের ঢং অনেকটা বাংলা সাহিত্যের নন্দলালের মত। সরকারী রোষ দৃষ্টি পড়ার ভয়ে দুলারা জনসভায় যেতে ভয় পায়, জেল হাজতের ভয়ে তারা রাজপথের মিছিলে যেতে পারে না, তারা চাঁদা দিতে ভয় পায় দেশদ্রোহী হিসেবে রিপোর্ট যাবে বলে আর আন্দোলনে যোগদান করা তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এই জন্যই যে, তারা মশা, মাছি, সাপ, জোঁক ইত্যাদি বিষাক্ত কীটের ভয় পায়, তাদের ছেলেমেদের উচ্চ শিক্ষা দিতে হবে, সৌখিন ও সুন্দরী স্ত্রীর দামী শাড়ী-গয়না কিনে দিতে হবে, ষোড়শী কন্যাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্মি অফিসার, গেজেটেড অফিসারের সাথে বিয়ে দিতে হবে..... ইত্যাদি। সুনাগরিক ও দেশপ্রেমিকের পরাকাষ্ঠা দেখাতে সরকারী আনুগত্যতা ও দালালীপনাকে চরম মাপকাঠি হিসেবে এরা বেছে নেয়। সরকারী কর্মকর্তা ও সেনা কর্তাদের সন্তুষ্টি বিধানই হচ্ছে তাদের দেশপ্রেমের ও নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট। তাই তারা সরকারের যে কোন হীন পরিকল্পনাকেও সমর্থন করে, তোতা পাখির মত সেনা কর্তাদের বুলি গলাধঃকরণ করে সশস্ত্র বাহিনীর প্রহরায় অনুষ্ঠিত সভা সমিতিতে শোষণের বুলি উদ্‌গিরণ করে। এসব সভা সমিতিতে তারা জুম্ম জনগণকে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার উপদেশ দেয়, শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর সঙ্গে আপোষের ডাক দেয় আর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামিল না হতে যুব সমাজকে উৎসাহিত করে। মূলতঃ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সহ যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই দুলা গোষ্ঠী প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা নিয়ে থাকে। বিশেষ করে পশ্চাদপদ কৃষি নির্ভর সামন্ত সমাজ ব্যবস্থায় এই সুবিধাবাদীদের জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকা একেবারে অবধারিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে এটা বরাবার প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজের দুর্বলচিত্ত, পরনির্ভরশীল, শ্রমবিমুখ ও রক্ষণশীল সামন্ত নেতৃত্ব সমসময় জাতীয় বিপ্লবের সময় প্রতিবিপ্লবী ও সুবিধাবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জুম্ম জাতির ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই ভারত বিভক্তির সময় এই সামন্ত নেতৃত্ব ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা না করে বরঞ্চ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। জুম্ম জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়ার ঘৃণ্য ফাঁদ কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ রোধ করতে তারা এগিয়ে আসেনি। বিভিন্ন সময়ে

পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান বাঙালীদের অনুপ্রবেশ ও এদের দ্বারা ভূমি বেদখল এবং শাসক-শোষক গোষ্ঠীর নির্যাতন শোষণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। কাপ্তাই বাঁধের ফলে ১৯৬৩ - ৬৪ ইং অর্ধলক্ষাধিক জুম্ম জনতার দেশত্যাগ কালে এই সামন্ত নেতৃত্ব তথা জাতীয় নেতৃত্ব এই দেশত্যাগের বিরুদ্ধে কোন জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকে। অনুরূপ বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধকালেও সামন্ত নেতৃত্ব জুম্ম জনতাকে সঠিক ভূমিকা পালনে যেমনি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত দিতে এগিয়ে আসেনি। অথচ ঐ সময়ে এই দুর্বল ও সুবিধাবাদী নেতৃত্ব স্ব-স্ব-স্বার্থ নিয়েই মশগুল থেকে জুম্ম যুবশক্তিকে বিভ্রান্ত করেছিল। মূলতঃ সামন্ত শ্রেণীর সংগ্রামবিমুখ ও আপোষকামী চরিত্রই জুম্ম জনগণের মাঝে কোন জাতীয় জাগরণ ঘটাতে পারেনি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তান শাসনামলে একদিকে প্রগতি বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল, আপোষমুখী ও সুবিধাবাদী সামন্ত নেতৃত্ব -- যে নেতৃত্ব জুম্ম জাতির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় বিরোধী অথচ দালালী করেও স্ব-শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, পক্ষান্তরে উদীয়মান গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল নেতৃত্ব যারা জুম্ম জনগণের ঘুঁনেধরা সামন্ততান্ত্রিক স্থবিরতা ও পশ্চাদপদতার অবসান ঘটিয়ে জুম্ম জাতির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প জুম্ম জাতীয় নেতৃত্বে এই দুই পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে জুম্ম জনগণের জাতীয় নেতৃত্বে উত্তরোত্তর জটিলতা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে থাকে।

অবশ্য সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে বৃটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির অনুরূপ স্বায়ত্তশাসন জুম্ম জনগণের জন্য সাংবিধানিকভাবে আদায়ের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ ও রক্ষণশীল সামন্ত নেতৃত্ব জনসংহতি সমিতির গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল নেতৃত্বের সাথে ১৯৭২ সালে সাময়িককালের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু উগ্রবাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী ও অগণতান্ত্রিক শক্তির দাপটে যখন জুম্ম জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবী ঘৃণাভরে প্রত্যাখাত হলো তখন থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত নেতৃত্ব ও সুবিধাবদী গোষ্ঠী বাংলাদেশের শাসক-শোষক শ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করতে থাকে। ফলতঃ সত্তর দশকের গোড়া হতেই জুম্ম জনগণের জাতীয় নেতৃত্বে ত্রিমুখী দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। প্রথমতঃ রাজা, হেড্‌ম্যান ও কার্বারী -- এই তিন -এ গঠিত সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব যারা সকলক্ষেত্রে সংগ্রাম বিমুখ, পশ্চাৎপদ, রক্ষণশীল, পরনির্ভরশীল ও প্রগতিবিরোধী। দ্বিতীয়তঃ যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিভিন্ন পেশা যেমন--চাকুরী, ঠিকাদারী, ব্যবসা, চাষাবাদ -এ নিয়োজিত সর্বোপরি গণপ্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংস্থা যেমন--ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও জাতীয় সংসদে নির্বাচিত এবং সরকারী মদতপুষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত এ শ্রেণীর জুম্ম নেতারা মুখ্যতঃ সকলক্ষেত্রে সুবিধাভোগী ও সুযোগ সন্ধানী। তাই এদের চরিত্রে দ্বৈত সত্ত্বা রয়েছে। একটা হচ্ছে এরা স্বীয় স্বার্থ পরিপূরণে সকল প্রকারের প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী ভূমিকা রাখতে যেমনি দ্বিধাবোধ করে না তেমনি শাসক-শোষক গোষ্ঠীর সাথে দালালী করতেও সিদ্ধহস্ত। অন্যটা হচ্ছে -- শাসক-শোষক গোষ্ঠীর সাথে দালালী করেও এরা যদি স্বীয় স্বার্থ পূরণে ব্যর্থ হয় অথবা প্রগতিশীল সংগ্রামী শক্তি যদি শাসক-শোষক গোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে সেক্ষেত্রে এরা আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনকে সমর্থন করে ও শাসক গোষ্ঠীর নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে থাকে। এমনকি প্রতিরোধের আন্দোলনে সামিল হয়ে থাকে। এক কথায় এদের মধ্যে একটা অংশ আছে যারা মুৎসুদ্দি চরিত্র সম্পন্ন আর অন্য অংশটা হচ্ছে জাতীয় চরিত্র সম্পন্ন। যারা মুৎসুদ্দি চরিত্র সম্পন্ন তারা বরাবরই সরকারের সাথে দালালী করে প্রতিক্রিয়াশীল ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকা পালন করে থাকে। পক্ষান্তরে যাদের জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম রয়েছে তারা অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একসময়ে প্রতিক্রয়াশীল ও দালালী ভূমিকা পালন করে থাকে। আরেক সময়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে থাকে শাসক-শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে উঠে। তৃতীয়তঃ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আদর্শে বিশ্বাসী এবং জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ও জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত যারা দেশপ্রেমিক , জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক , প্রগতিবাদী ও বিপ্লবী ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে জুম্ম জনগণের উপর চরম অত্যাচার, নির্যাতন ,হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ , অগ্নি-সংযোগ, বেআইনী অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখলসহ সর্বপ্রকার মানবাধিকার লঙিঘত হলেও এই সামন্ত নেতৃত্ব এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সুবিধাবাদী গোষ্ঠী কোন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। অথচ জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পরিচালিত জুম্ম ছাত্র - জনতার সকল মানবাধিকার লংঘনের প্রতিরোধাত্বক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সামন্তবাদী নেতৃত্ব ও সুবিধাভোগী ও সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী আজকের দুলা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তথা জুম্ম জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে এই দুলা গোষ্ঠীর অবাধ পদচারণা রয়েছে। বিভিন্ন ছদ্মবেশে এরা তাদের হীনমুখোশকে আড়াল

করে আত্ম -নিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে বিভ্রান্ত অথবা বানচাল করতে সদা সচেষ্ট রয়েছে। ধর্মের লেবাস পড়ে স্বধর্মের উন্নতি, দুঃস্থ মানুষের সেবা ও মানবতার নামে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা ও অনাথ আশ্রম গঠন করে যেমনি এই প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, দালালী ও স্বার্থবাদী দুলাগোষ্ঠী দেশে বিদেশে জুম্ম স্বার্থ বিরোধী হীন কাজে লিপ্ত রয়েছে তেমনি

পার্বত্য চট্টগ্রাম হেড্‌ম্যান এসোসিয়েশন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সরকারের সৃষ্ট ও মদতপুষ্ট ট্রাইবেল কন্‌ভেনশন, পার্বত্য জেলা পরিষদ, চাকমা উন্নয়ন সংস্থা, ত্রিপুরা উন্নয়ন সংস্থা, মারমা উন্নয়ন সংস্থা, মারমা কল্যাণ সমিতি, গণপ্রতিরোধ বাহিনী, টাইগার বাহিনী, পার্বত্য মানবাধিকার সংস্থা, গণপ্রতিরোধ কমিটি, সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি প্রভৃতি রঙবেরঙের সংগঠনকে অবস্থান করে একদিকে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার

আন্দোলনে নানাভাবে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করছে অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী সরকারকে সকলক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করে জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের পথ ত্বরান্বিত করছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যে কোন সরকারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যোগসাজসের মাধ্যমে নিজেদের উদরপূর্তিসহ তথাকথিত স্বচ্ছল ও সম্মানজনক সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করাই হচ্ছে দুলাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা কোন অন্যায়ের

প্রতিবাদ করতে পারে না। লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী যারা জুম্মদের ভূমি, বাগ-বাগিচা বেদখল করছে, সুবিধাভোগী এই দুলাগোষ্ঠী কোনদিন এই অনুপ্রবেশ বন্ধের ও অনুপ্রবেশকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিস্কারের দাবী করতে এগিয়ে আসেনি। তারা কোন ধর্ষণকারী অথবা দাঙ্গাকারীদের শাস্তির দাবী নিয়ে রাজপথে মিছিল করতে পারেনি। জুম্ম স্বার্থবিরোধী কোন সরকারী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তারা কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি।

জনসংহতি সমিতি তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকারীদের দমনের নামে নিরপরাধ জুম্ম জনগণের উপর শত অত্যাচার, নিপীড়ন, অগ্নি-সংযোগ , লুন্ঠন , ধর্ষণ , গ্রেপ্তার, মারপিট প্রভৃতি মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধেও কোন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে পারেনি। অন্যদিকে তারা সব অন্যায় , অবিচার ও নির্যাতনকে মেনে নিয়ে জুম্ম জনগণের সামগ্রিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু উদর পূর্তি সহ স্বীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জুম্ম স্বার্থবিরোধী সকল সরকারী পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে চলেছে। । কি জঘণ্য তাদের তথাকথিত দেশ ও জাতির সেবা।

এই প্রতিক্রিয়াশীল , সুবিধাবাদী ও গণবিরোধী দুলাগোষ্ঠী নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে জুম্ম জনগণের কতই না সর্বনাশ করছে ও জুম্ম জনগণের বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিচ্ছে বারবার। তারা জুম্ম স্বার্থবিরোধী সকল সরকারী ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার যোগসাজশ করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে বিপরীত ভূমিকা পালন করছে। সরকার তাদের এই দালালী ভূমিকা দিয়ে দেশে বিদেশে জনমত সৃষ্টি করে জুম্ম জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। তাদের ভীরুতা ও আপোষকামিতার সুযোগ আগ্রাসী বাহিনী হিংস্রতার থাবা প্রসারিত করছে , দুলাদের হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত সমর্থন ও সহযোগিতায় স্বৈরচারী সরকার জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ও গণবিরোধী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে আর সর্বস্তরের সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিভূ হয়ে জুম্ম জাতির বিরুদ্ধে মীরজাফরী ভূমিকা পালন করছে। তারা সাময়িককালের আত্মতুষ্টি ও আত্মসুখে বিভোর হয়ে সরকারী উচ্ছিষ্ঠ ভোগে নিজেদের সমর্পিত করে নির্লজ্জ ও বিবেকবর্জিত ভূমিকা রেখে চলেছে। বলাবাহুল্য তাদের এই জঘণ্যতম ভূমিকার জন্য জুম্ম জাতি কোনদিনই তাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে না।

জুম্ম জনগণের চলমান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের প্রতি এরূপ চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার জন্য এই দুলাগোষ্ঠী আজ জুম্ম জনগণের মাঝে চরমভাবে ধিকৃত ও ঘৃণিত । সংগ্রামী জুম্ম যুব-ছাত্র-কৃষক-শিক্ষক - জনতা আজ তাদেরকে দেশ ও জাতির ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতিবিপ্লবী হিসেবে চিহ্নিত করছে। জাতীয় অস্তিত্ব, জন্মভূমির অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাসে তাদের স্থান হবে প্রতিক্রিয়াশীল, স্বার্থবাদী ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে। ইতিহাস তাদের কখনও ক্ষমা করবে না।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার - শ্রী রবি)

নারী মুক্তি প্রসঙ্গে এম এন লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারী নির্যাতন

• শ্রীমতি পল্লবী

।। এক ।।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা তথা নারী মুক্তির যে সংগ্রাম অদ্যাবধি দেশে দেশে চলে আসছে তা কেবলমাত্র নারী সমাজের একক সংগ্রাম নয়। সমস্ত নিপীড়িত, নির্যাতিত ও অধিকারহারা মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে নারী মুক্তি সংগ্রাম অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। তাই নারী অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন তথা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সাথে সামিল করা ব্যতীত নারীর প্রকৃত মুক্তি অর্জন হতে পারে না। পক্ষান্তরে নারীর প্রকৃত মুক্তি ব্যতীত জাতীয় মুক্তি তথা বিশ্বের নিপীড়িত ও শোষিত মানুষেরও প্রকৃত মুক্তি অর্জিত হতে পারে না।

জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনতার পরম বন্ধু, মহান চিন্তাবিদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নারী অধিকার ও নারী মুক্তি প্রসঙ্গে ছিলেন সদা সচেতন ও সোচ্চার। জুম্ম নারী জাগরণসহ বাংলাদেশের নিপীড়িতা, শোষিতা, ও বঞ্চিতা ব্যাপক নারী সমাজের মুক্তির জন্য তিনি আজীবন নিরলস সংগ্রামেও ব্যাপৃত ছিলেন। বাংলাদেশের নিষিদ্ধ পল্লীর অলিতে গলিতে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিতা মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিতা মহিলাসহ বাংলাদেশের আপামর নির্যাতিতা মহিলাদের মুক্তির কথা তিনি তৎকালীন গণ- পরিষদ ও জাতীয় সংসদে বারবার তুলে ধরেছিলেন।

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় নারী সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থানের নানা পরিবর্তন হয়েছে। সমাজ ও সভ্যতার ঊষালগ্নে নারীর স্থান ছিল মর্যাদাপূর্ণ। তখন ছিলনা নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ ও বৈষম্য। কিন্তু ক্রমবিকাশের এক পর্যায়ে নারী সমাজের উপর নেমে আসে পুরুষের চরম আধিপত্য ও নির্মম পারিবারিক দাসত্ব। মানব সমাজ যতই সভ্যতার দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকে ততই নারী সমাজের উপর দাসত্ব ও অধীনতা জঘন্যভাবে জাঁকিয়ে বসতে থাকে। জুম্ম নারী সমাজও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ যুগ যুগ ধরে সামন্ত তান্ত্রিক শাসন শোষণে নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। এই সামন্ত শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের জাতীয় বিকাশ ও স্বার্থের দিকে কোনদিন মনোযোগ দেয়নি। তাই জুম্ম সমাজে নারীর স্থান একেবারেই নিকৃষ্ট পর্যায়ে। পুরুষের ভোগ্যবস্তু, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ও পারিবারিক দাসী ছাড়া নারীদের আর অন্য কিছু ভাবা হয় না। আঁতুর ঘর, রান্নাঘর ও শয়নঘর— এই তিন কামরার গণ্ডিবদ্ধ খাঁচায় তাদের সারাজীবন তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যায়। ঘরকন্যার কাজ যতই পরিশ্রমের হোক না কেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তার কানাকড়িও মূল্য দেয়া হয় না। পাশা পাশি পুরুষের সাথে তাদেরকে উৎপাদনের কাজেও অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু উৎপাদন শক্তির উপর নারীর অধিকার সমাজে স্বীকৃত হয় না। যৌন সম্ভোগ, সন্তান লালন পালন, ঘরকন্যার কাজ প্রভৃতি অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে জুম্ম নারীরা পায় মাত্র ন্যূনতম জীবন ধারণের খাদ্য ও লজ্জা নিবারণের ন্যূনতম বস্ত্র। তার অধিক নারীদের বিন্দুমাত্র অধিকার প্রদানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বরদাস্ত করে না। অধিকন্তু সামান্য পদস্খলনে তাদের উপর নেমে আসে অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন যার মাত্রা মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে।

পশ্চাৎপদ ও রক্ষণশীল সামন্ততান্ত্রিক শাসন শোষণের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে জুম্ম জনগণের উপর যুগ যুগ ধরে চলে আসছে নির্মম বিজাতীয় শাসন শোষণ। বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ— এই সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শাসকগোষ্ঠীর হাতে জুম্ম জনগণের ভাগ্যের চাবিকাঠি পর্যায়ক্রমে পালাবদল হয়ে আসছে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর শুরু হল উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠার হীন ষড়যন্ত্র। ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের জঘন্য পরিকল্পনা অতি দ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত হতে থাকে। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলোপ সাধন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ বিস্তারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাজার হাজার সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োগ করা হয় এবং পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মুসলমানকে বেআইনীভাবে বসতিদানের হীন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। জুম্ম জনগণের উপর চলতে থাকে বেপরোয়া অত্যাচার, নির্যাতন, গণহত্যা, জেল জুলুম, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তরকরণ প্রভৃতি শ্বেত সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাসের অন্যতম শিকার হলো জুম্ম নারী সমাজ। সেনাবাহিনী ও অনুপ্রবেশকারী পুরুষেরা জুম্ম নারীদের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। ফলে জুম্ম নারীদের উপর চলতে থাকে অমানুষিক অত্যাচার, নিপীড়ন, পাইকারী ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, পথে-ঘাটে ও অফিস - আদালতে শালীনতা হানি, জোরপূর্বক বিবাহ, ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ প্রভৃতি মানবতা বর্জিত জঘন্য কার্যকলাপ।

মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম নারীদের এই করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে খুবই পীড়িত হতেন, আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়তেন। একাধারে পারিবারিক জীবনে পুরুষের আধিপত্য এবং জাতীয় জীবনে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের চরম শিকার—এই দ্বৈত অত্যাচার নিপীড়নের মাঝে এম এন লারমা জুম্ম নারী সমাজের মধ্যে এক দুর্বার সংগ্রামী শক্তি প্রত্যক্ষ করতেন। জুম্ম নারী সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার অপরিহার্যতা তিনি গভীরভবে অনুভব করতেন।

সামন্ত্রতান্ত্রিক জুম্ম সমাজ নারীদের উপর এযাবৎ কেবল শোষণের ষ্টীম রোলার চালিয়ে এসেছে, নারী সমাজকে কেবল ঘুম পাড়ানির গান শুনিয়ে এসেছে, নারী সমাজকে কেবল ঘুম পাড়ানির গান শুনিয়ে এসেছে, সর্বোপরি নারীদের উপর ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের অত্যাচার নিপীড়ন নীরবে নিভৃতে প্রত্যক্ষ করে এসেছে। কিন্তু তাদের মুক্তির কথা, তাদের অধিকারের জয়গান কেউই কোনদিন শোনাতে এগিয়ে আসেনি। সত্তর দশকে বর্তমান নেতা সন্তু লারমাকে সাথে নিয়ে এম এন লারমাই সর্বপ্রথম জুম্ম নারীসমাজের মুক্তির বাণী উচ্চারণ করলেন। জুম্ম নারী সমাজকে পুরুষের আধিপত্য ও পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্তির মহান প্রয়াসে অধিকার সচেতন করে সংগঠিত করার রাজনৈতিক তাগিদ অনুভব করলেন। সর্বোপরি তিনি অনুভব করলেন—সমাজের অর্ধেক অংশই নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অধিকার সচেতন করে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে জাতীয় মুক্তি ত্বরান্বিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে একমাত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নারী সমাজের সক্রিয় অংশ- গ্রহণের মাধ্যমেই প্রকৃত নারী মুক্তির পথ উন্মুক্ত হতে পারে। অতএব তিনি জুম্ম এযাবৎ কেবল শোষণের স্টীম রোলার চালিয়ে এসেছে, নারী সমাজকে কেবল ঘুম পাড়ানির গান শুনিয়ে এসেছে, সর্বোপরি নারীদের উপর ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের অত্যাচার নিপীড়ন নীরবে নিভৃতে প্রত্যক্ষ করে এসেছে। কিন্তু তাদের মুক্তির কথা, নারীর মরণ ফাঁদ ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সহ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে জুম্ম নারী সমাজকে সামিল করার মহান উদ্যোগের প্রয়াসী হলেন। শুরু হলো জুম্ম নারী সমাজকে সংগঠিত করার মহান উদ্যোগ। নারীর অধিকার ও এই অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচারণার মধ্য দিয়ে জুম্ম নারী সমাজকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও সামিল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। বস্তুতঃ জুম্ম নারী জাগরণ সংঘবদ্ধভাবে শুরু হয় সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে। সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত স্বাধীন বাংলাদেশে জুম্ম জনগণের স্বায়ত্বশাসনের নববাণী তখন পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ১৯৭২ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি গঠিত হলো জুম্ম জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক পার্টি"পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি"। জুম্ম জনগণের আলোকবর্তিকা ও গণপ্রতিনিধি এম এন লারমা জুম্ম জনগণের স্বায়ত্বশাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ন্যায়সঙ্গত দাবী হাতে নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণ পরিষদ ও জাতীয় সংসদের ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন করছিলেন। কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকারসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসনের অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে একদিকে জুম্ম জনগণের উপর নেমে আসে নির্মম নির্যাতন-নিপীড়ন, অন্যদিকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হতে থাকে। তাই শুরু হল সশস্ত্র আন্দোলনের সতর্ক উদ্যোগ। বর্তমান নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার মুখ্য ভূমিকায় ১৯৭৩—এর ৭ই জানুয়ারী গঠিত হলো জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন "শান্তিবাহিনী"।

তারই পাশাপাশি জুম্ম নারীদের সংগঠিত করে একটি শক্তিশালী নারী সংগঠন গঠনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো। ১৯৭৩ সালের প্রারম্ভে এক পর্যায়ে মহিলা সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে অগ্রগামী জুম্ম মহিলাদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হতে থাকে। আঞ্চলিক কমিটির সদস্যগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে জুম্ম নারী সমাজকে সংগঠিত করার কাজে নেমে পড়লেন। অবশেষে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ সনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি' নামে জুম্ম নারীদের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটলো।।

।। দুই।।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির ইশতেহারে বলা হয়েছে যে— পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থা মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিক পিতৃ প্রধান মতাদর্শ ও ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই চট্টগ্রামের নারী জাতি সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী শাসন, শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ছাড়াও পুরুষদের দ্বারা শাসিত হওয়ার ফলে অকথ্য নির্যাতন, নিপীড়ন ও অমানুষিক অত্যাচার ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে। নারী জাতি পরনির্ভরশীল হওয়াতে সমাজ জীবনে অপাংক্তেয়া, অবহেলিতা ও ভোগ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অথচ নারী ও পুরুষ যদি সম্মিলিতভাবে সংগ্রামমুখর না হয় তাহলে সমাজ জীবন হতে সকল প্রকারের শোষণ ও ভেদাভেদ নির্মূল করার কোন কল্পনাই করা যায় না। নারীর সৃজনী প্রতিভা ও সংগ্রামী ভূমিকা যে পুরুষের সংগ্রামী জীবনে অপরিহার্য একথা বিশ্বের দেশে দেশে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি নারী জাতিকে অগ্রসর করতে না পারলে কোন দেশ বা জাতিকে সকল প্রকারের জাতিগত ও শ্রেণীগত অন্যায় শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করা অসম্ভব । তাই নারী জাতিকে দেশ ও জাতির উন্নয়নকল্পে ও গঠনমূলক সংগ্রামে অংশীদার করানোর মাধ্যমে বিশ্বের নিপীড়িত ও নির্যাতিত জাতি ও সর্বহারা মানুষের সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করার পূর্ণ সুযোগ উন্মুক্ত করে দিতে হবে। আজ সারা বিশ্বে নারী জাতি রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক , সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সকল প্রকারের নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করার লক্ষ্যে সংগ্রাম করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী সমাজ এর থেকে ব্যাতিক্রম থাকতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির অর্ধেকাংশ হচ্ছে নারী। সুতরাং এই নিপীড়িতা, নির্যাতিতা, বঞ্চিতা, লাঞ্ছিতা ও শোষিতা নারী সমাজকে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ ও সুসজ্জিত করে একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ও পিতৃপ্রধান মতাদর্শ ও ব্যবস্থার নিপীড়ন ও শোষণ এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, উগ্রবাঙালী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের ধারক বাহক বাংলাদেশ সরকারের শাসন ও শোষণের অবসান করণার্থে সর্বোপরি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার

আন্দোলন অনিবার্যভাবে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে।

১৯৭৫ সালের ১০ আগস্ট, শনিবার সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে ও জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে মহিলা সমিতির প্রথম প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা সমিতির অন্যতমা নেতৃস্থানীয়া সদস্যা শ্রীমতী মিনুপ্রু মার্মা এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনে বিভিন্ন আঞ্চালিক কমিটি থেকে ৬৫(পঁয়ষট্টি) জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। পার্টির পক্ষ থেকে সন্তু লারমার নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনেই একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রিয় কমিটি গঠন করা হয়। সভানেত্রী হিসেবে মাধবী লতা চাকমা, সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে জয়শ্রী দেওয়ান ও সাংগঠনিক সম্পাদিকা হিসেবে দীপ্তি চাকমা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিতা হন। তৎপরে চির অবহেলিতা পশ্চাদপদ জুম্ম নারী সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করার কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে জোরদার হতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বপ্রথম ৩৫(পঁয়ত্রিশ) জন মহিলা সমিতির সদস্যা নিয়মিতভাবে শান্তিবাহিনীতে যোগ দান করেন। জুম্ম নারীদের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান জুম্ম নারী মুক্তি তথা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে ।

নারী মুক্তি আন্দোলনের এই অগ্রযাত্রা কিন্তু সহজ সরল পথে এগোয়নি। নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা পথে এগোতে হয়েছে। রক্ষণশীল জুম্ম সমাজ নারী সমাজের এই বর্হিমুখী পদচারণা সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। সমাজের নানা কটূবাক্য ও উপহাস জুম্ম নারীদের শুনতে হয়েছে। মহিলা কর্মীদেরকে নানা অভিধায় আখ্যায়িত হতে হয়েছে। মাতা - পিতা, অভিভাবক , স্বামী সর্বোপরি পুরুষের নানা বাদার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা সত্বেও সন্তুলারমা ও এম এন লারমা সামন্ত সমাজের প্রতিক্রয়াশীলতা ও রক্ষণশীলতা উপেক্ষা করে অতন্ত্য সুকৌশলে নারীদের আত্মনিয়ন্ত্রণানিধকার আন্দোলন সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রিয় নেতা এম এন লারমা বরাবরই প্রতিটি বিষয়ে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতেন। তাই জুম্ম নারীদের কেন অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হবে, জুম্ম নারীদের উপর অন্যায় অবিচারের প্রকৃত কারণ নি, নারী সমাজের উপর যে শোষণ নিপীড়ন চলছে তা থেকে মুক্তির প্রকৃত উপায় কি, কেন জুম্ম নারীদের জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে সামিল হতে হবে ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর যেন মহিলা সমিতির নেতৃবৃন্দ তথা জুম্ম নারী সমাজ নিজেরাই খুঁজে পেতে পারে সেভাবে তিনি তাদের প্রশ্ন করতেন, তাদের সাথে আলোচনা করতেন। কারণ নারী সমাজের মধ্যে যদি অধিকার সচেতনতা গড়ে না উঠে তাহলে প্রকৃত নারী মুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্যাতন তথা পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বরাবরই সোচ্চার। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সময় ও সুযোগ পেলেই প্রায়ই পুরুষ কর্মীদের সাথে আলোচনা করতেন। কেন না নারীর অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে নারী সমাজের পাশাপাশি পুরুষদেরও সমতালে এগিয়ে আসার অপরিহার্যতা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। তিনি এটাও ভালভাবে জানতেন যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিদ্যমান নারী নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে পুরুষ সমাজ ও নারী সমাজকে সচেতন করার কাজ সহজসাধ্য নয়। সমাজের প্রচলিত ধ্যান- ধারণা, রক্ষণশীলতা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা থেকে উদ্ভূত নানা সমস্যা সহজে দূর করা সম্ভব নয়। সামাজিক কাঠামো ও প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমেই তবে নারী মুক্তির বদ্ধ দুয়ার খোলা সম্ভব হতে পারে।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের গতি যতই জোরদার হতে থাকে শাসকগোষ্ঠীর দমন পীড়নের মাত্রাও তত বৃদ্ধি লাভ করে থাকে। ১৯৭৬ সাল হতে সশস্ত্র বাহিনীর উপর শান্তিবাহিনীর হামলা শুরু হলে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করতে থাকে। ফলে সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক সন্ত্রাসসহ হত্যা, লুণ্ঠন, ধরপাকড় , অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ চরমভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষতঃ জনসংহতি সমিতির পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের ধরপাকড় এবং গ্রেপ্তারকৃত কর্মীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন এবং আটকাবস্থায় হত্যা করা হতে থাকে। এমতাবস্থায় মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তা ও চলাফেরা এবং মহিলা সমিতির কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে আন্দোলনের এক পর্যায়ে মহিলা সমিতির কার্যক্রমের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে সীমিত হতে থাকে। কিন্তু সত্তর দশকে যে নারী জাগরণের উত্তাল ঢেউ পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে উদ্বেলিত হয়ে উঠে তার ফলে জুম্ম নারী মুক্তি তথা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। জুম্ম নারী সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে অধিকার সচেতনতা এবং কঠোর সংগ্রামী প্রত্যয় সৃষ্টি হতে পেরেছে। সেই সূত্র ধরে এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সত্তর দশকের প্রারম্ভ থেকে জুম্ম নারী সমাজে যে জাগরণের ঢেউ জেগেছিল, যে সংগ্রামী প্রেরণার ধারা শুরু হয়েছিল সেই জাগরণের ঢেউ ও সংগ্রামী ধারা শাসকশোষক গোষ্ঠীর নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও সামরিক সন্ত্রাসের দ্বারা দমন ও নিঃশেষ করা সম্ভব হয়নি। আজো জুম্ম নারী সমাজের একটি অংশ যারা উপনিবেশিক শাসন শোষণ ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পারিবারিক দাসত্ব থেকে নারী সমাজকে মুক্তি দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সেই অগ্রগামী ও অধিকারকামী নারী সমাজ পুরুষের পাশাপাশি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে সামিল রয়েছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটেও যেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি নানা কৌশল অবলম্বন করে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদা সচেষ্ট ও সক্রিয় রয়েছে তেমনি সত্তর দশকের জুম্ম নারী সমাজের জাগরণের ধারাবাহিকতা হিসেবে ১৯৮৮ সালের ৮ই মার্চ গৌরি চাকমা ও শিলা চাকমার নেতৃত্বে "হিল উইমেন ফেডারেশন" নামে আরেকটি নারী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়ে উঠে। ১৯৯৫ সালের ১৫ জানুয়ারী এই সংগঠনের

প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই এই মহিলা সংগঠন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের সামরিক সন্ত্রাসের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারী জাতির উপর যে নির্যাতন নিপীড়ন চলছে তার বিরুদ্ধেও এই সংগঠন দেশে বিদেশে সোচ্চার হয়ে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে প্রয়াসী রয়েছে। এ বছরের ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে বেজিঙে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে " চিল উইমেন ফেডারেশনের" দুই সদস্যা বিশিষ্ট একটি বেসরকারী প্রতিনিধিদল যোগদান করে জুম্ম নারীদের অবস্থার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের নব জাগরণের যুগে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের ভাবাদর্শে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমানাধিকারের আন্দোলন শুরু হয়। নারীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রতি শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি ও সম্ভাবনা জাগ্রত করার মানসে নারী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আন্দোলনের প্রারম্ভে মনে করা হলেও কিন্তু কালক্রমে আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ইহা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে প্রকৃতপক্ষে নারী আন্দোলন শুধুমাত্র নারী সমাজের জন্য হতে পারে না বরঞ্চ ইহা সমগ্র সমাজের জন্যই ও সমগ্র সমাজের স্বার্থে এই আন্দোলন। অতএব নারী আন্দোলনের সফলতা ব্যর্থতা সবই হচ্ছে সমগ্র সমাজের সাফল্য অসাফল্য । ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই বিংশ শতাব্দীর অন্তিম দশকের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত শ্রেণী সংগ্রাম ,জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম, জীবন জীবিকা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারী জাতি সাংগঠনিক উপায়ে অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে বটে কিন্তু বিশ্বের সমগ্র নারী সমাজের অধিকাংশই এখনো অর্থনৈতিক অধিকার (স্বাধীনতা)থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। বস্তুতঃ পুরুষের উপর অর্থনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নারীরা কখনোই সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত অধিকারকে কাজে লাগাতে পারে না।তাই নারী জাতি আজো পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পারিবারিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হচ্ছে ও সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সকল ক্ষেত্রে নিপীড়িতা ও লাঞ্ছিতা হচ্ছে।

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সনদে নারীর সমানাধিকার ঘোষণা দেয়া হয় এবং ১৯৭৬-১৯৮৬ সালকে নারী দশক হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু জাতিসংঘের এসব যুগান্তকারী ঘোষণা নারী জাতির মুক্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তেমন কোন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেনি।বস্তুতঃ বিশ্বের দেশে দেশে নারী আন্দোলন চলে আসছে। চলছে বিশ্বব্যাপী বিশ্ব নারী আন্দোলন। কিন্তু বিশ্বের দেশে দেশে যে গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলন চলছে তা সমাজের কোন শ্রেণীর স্বার্থে ও কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। তা নাহলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে নারী আন্দোলন চলে আসছে তার প্রকৃত তাৎপর্য মূল্যায়ন করা যাবে না। নারী আন্দোলনকে অবশ্যই একটা গণআন্দোলন হিসেবে এগিয়ে নিতে হবে। নারীদের অধিকার ও মর্যাদার বিষয়টি অবশ্যই বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যাবে না। নারীর অধিকার অর্জনের অর্থ পুরুষের অধিকার খর্ব করা নয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে শাসক শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে শোষিত ও নিপীড়িত জাতি ও মানুষের জন্যই এই নারী আন্দোলন। নারীদের বৈষম্যের কারণ হিসেবে পুরুষদের চিহ্নিত করা, পুরুষ কর্তৃক নারীর উপর যৌন নির্যাতনকে সামাজিক বৈষম্যের মূল কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করাই নারী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করা এবং পুরুষের আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করাই নারী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা ইত্যাদি বিভ্রান্তিকর ও হঠকারী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিটি দেশের নারী আন্দোলনের সংঘবদ্ধভাবে বিরোধিতা করা বাঞ্চনীয়। নারী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হতে হবে—নারীদের সামাজিক কাজের উৎপাদনের মধ্যে টেনে আনা ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করা, পারিবারিক দাসত্ব থেকে নারীদের মুক্ত করা এবং রান্নাঘর ও আঁতুর ঘরের অবমাননাকর কাজ ও অধীনতা থেকে নারীদের মুক্ত করা। এই লক্ষ্য সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতিকে অন্যান্য গণতান্ত্রিক জুম্ম মহিলা সংগঠনসমূহ সাথে নিয়ে সামন্ততান্ত্রিক পারিবারিক দাসত্বে আবদ্ধ ও উপনিবেশিক শাসন শোষণে শোষিত ও নিপীড়িত জুম্ম নারী সমাজের মুক্তি অর্জনে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। তবেই নারী মুক্তি প্রশ্নে এম এন লারমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

।। তিন।।

সাধারণভাবে নারী নির্যাতন হচ্ছে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের একটি অনিবার্য্য ফলশ্রুতি। সমাজ যেখানেই বিভক্ত সেখানে শাসন শোষণ যেমন বর্তমান তেমনি নারী নির্যাতন সেখানেই অবধারিত। দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, ও আজকের পুঁজিবাদী সমাজে নারী বরাবরই অবহেলিত ও নির্যাতিত। সমাজ জীবনে তাদের হেয় চোখে দেখা হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা থাকলেও আর্থিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। পুরুষ প্রধান পারিবারিক জীবনে নারীদের অবস্থান অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। যতই সে কঠিন পরিশ্রম করে ঘরকন্নার কাজ করুক না কেন সেটার কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব সমাজে নেই। একদিকে বৈষম্যমূলক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী অন্যদিকে ধর্মীয় অনুশাসন নারীকে করে রেখেছে বন্দী। যেহেতু তাদের কাজকে উৎপাদনমুখী বলে সমাজ স্বীকার করতে চায় না সেহেতু অর্থনৈতিকভাবে তারা পুরুষের অধীন। ধনতান্ত্রিক সমাজে নারীদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অধিকার থাকলেও তাদের পণ্যে পরিণত করে নির্যাতন থেকে রেহাই দেয়া হয় না। অন্যদিকে অনুন্নত অর্থনীতি ও অনগ্রসর সমাজ ব্যবস্থায় নারী নির্যাতন ভিন্ন মাত্রায় থাকে। সেদিক থেকে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী সমাজের নির্যাতনের চিত্রটিও কোন ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীন ও শিক্ষিত জাতির একজন নারী যেভাবে নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে অন্য এক পরাধীন ও অনগ্রসর জাতির নারীর উপর নির্যাতনের

মাত্রা তুলনামূলকভাবে অধিকতর বিদ্যমান। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক , উপনেবেশিক ও পশ্চাৎপদ হওয়াতে জুম্ম নারীরা সমাজে দুই ভাবে নির্যাতিত হচ্ছে—

১) ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক জুম্ম সমাজে একজন নারী হিসেবে ও ২) উপনিবেশিক শাসনে শাসিত সংখ্যালঘু জুম্ম সমাজের একজন সদস্যা হিসেবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে সারা দেশের সংখ্যালঘু জাতি সমূহের মত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরাও বিভিন্নভাবে উপেক্ষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে। সংখ্যালঘুদের পৃথক অস্তিত্বের কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকায় জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়। নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব, জন্মভূমির অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ যখন আন্দোলন করতে বাধ্য হয় তখন থেকেই বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম অধিকতরভাবে জোরদার করতে থাকে। ফলতঃ জুম্ম নারী সমাজের উপর দমন পীড়নের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিম্নোক্ত উপায়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংশের কার্যক্রম চলতে থাকে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিক বাহিনী মোতায়েন ও সামরিক সন্ত্রাস সৃষ্টি,

২) সমতল এলাকা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশকরণ ও অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসন প্রদান ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা সংঘটিতকরণ ,

৩) জাতি ও সম্প্রদায় ভিত্তিক দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন গঠন,

৪) ব্যাপক হারে রাস্তাঘাট তৈরী এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ,

৫) পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন বোর্ড গঠন ও দেশে বিদেশে অপপ্রচারণা,

৬) সেনাবাহিনী কর্তৃক শান্তকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন,

৭) গুচ্ছগ্রাম সৃষ্টি,

৮) পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন,

~~৯) ব্যাপ~~কভাবে অত্যাচার , নির্যাতন, গ্রেপ্তার, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুঠপাট, গণহত্যা, জেল জুলুম, অর্থনৈতিক অবরোধকরণ ইত্যাদি।

তথাকথিত আইন শৃংখলা রক্ষার অছিলায় বাংলাদেশের সরকারসমূহ যেভাবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক জুম্ম জনগণের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে সেখানে জুম্ম নারীরা হচ্ছে অন্যতম লক্ষ্যবস্তু। স্বভাবতই এখানে নারীর উপর নির্যাতনের চিত্রটি বেশ ভয়াবহ ও নির্মম। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন বানচাল করার লক্ষ্যে সরকারের তথাকথিত সন্ত্রাস মোকাবেলার নামে গৃহীত অনেক প্রক্রিয়ার মধ্যে নারী নির্যাতন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও বহুল ব্যবহৃত। নিম্নে উল্লিখিত কিছু তথ্য থেকে সশস্ত্র বাহিনী ও অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা জুম্ম নারী নির্যাতনের মাত্রা সহজেই বুঝা যায়—

সময়কাল	জুম্ম নারী ধর্ষিতার সংখ্যা
১৯৮৫ ইং	৫৮ জন
১৯৮৬ ”	১৩২জন
১৯৮৭ ”	২১ ”
১৯৮৮ ”	১৯ ”
১৯৮৯ ”	৪৩ ”
১৯৯০ ”	১৬ ”
১৯৯১ ”	১১ ”
১৯৯২ ”	৮১ ”
১৯৯৩ ”	১৭ ”
১৯৯৪ ”	৩৮ ”
১৯৯৫ ” (অক্টোবর পর্যন্ত)	৩৩ ”
	৪৬৯

সর্বমোট ৪৬৯ জন

ধর্ষণ ছাড়াও আরও নানাভাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মুসলিমরা জুম্ম নারীর উপর নির্যাতন করে থাকে। যেমন ধর্ষণের চেষ্টা, হয়রানি , শারীরিক অত্যাচার, কটুক্তি, জোরপূর্বক বিবাহ, ধর্মান্তর ইত্যাদি। এই নির্যাতনের মধ্যে বালিকা, কিশোরী, যুবতী ও প্রৌঢ়া রয়েছে। ধর্ষণ ছাড়া বাকী যে নির্যাতনের ধরণগুলো রয়েছে সেগুলোতে যদি পরিসংখ্যান দেখানো হতো তবে সেগুলোর সংখ্যা হত অনেক অনেক বেশী। নারী নির্যাতনের এই যে চিত্রটি পাওয়া যায় তাতে এটাই পরিস্কার যে সরকারের দমন প্রক্রিয়ায় নারীকে করা হয়েছে একটি নির্যাতন ও অত্যাচারের মাধ্যম।

জুম্ম নারীদের কেবল যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বা অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মুসলমানরা প্রত্যক্ষভাবে নির্যাতন করছে তাই নয় পরোক্ষেও এই নির্যাতন প্রক্রিয়া তারা চালিয়ে যাচ্ছে। নানাভাবে উত্যক্ত করে বা প্রলোভন দেখিয়ে জুম্ম নারীদের হয়রাণি করছে। বিশেষতঃ যে সমস্ত ক্যাম্প জুম্ম লোকালয়ের কাছাকাছি সেসব ক্ষেত্রে স্থানীয় জুম্ম মেয়েদের যে কোনোভাবে শ্লীলতা হানির হীন উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের গোপণ ইন্ধন দেয়া আছে বলে জানা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে চাকরী বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির কোটা কিংবা বিশেষ বিশেষ সুবিধা দিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ জুম্ম মেয়েদের শ্লীলতা হানির চেষ্টা করছে। অনেক সময় কারো ভাই, স্বামী বা বাপকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে বাধ্য করা হচ্ছে তার বোন, স্ত্রী বা মেয়েকে সেখানে দেখা করতে ও সংশ্লিষ্ট কম্যাণ্ডারের ভোগ্যপণ্য হতে। যেহেতু সামরিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জুম্মদের চাকরী ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয় সেহেতু চাকরী দেয়ার নামে—

বা ভর্তি করানোর নামে তারা জুম্ম মেয়েদের হয়রাণি করার অবাধ সুযোগ পাচ্ছে। সরকার ঘোষিত উক্ত সুযোগ সুবিধাগুলো সেনা কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে চাকুরীর ক্ষেত্রেও জুম্ম নারী চাকুরীজীবীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পোষ্টিং না দিয়ে দেয়া হয় সমতল এলাকায়। এটাও নারী নির্যাতনের আওতায় পড়ে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক সন্ত্রাস বৃদ্ধি পায় এবং পুরুষদের যেখানে সেখানে শারীরিক অত্যাচার, গ্রেপ্তার , হয়রাণি ইত্যাদি করা হয়ে থাকে তখন জুম্ম নারীদের বাধ্য হয়ে বাজারে কেনাবেচা থেকে শুরু করে সকল প্রকার পারিবারিক কাজ সম্পন্ন করতে হয় । এতে জুম্ম নারীরা প্রায়ই লাঞ্চনার শিকার হয়। বিশেষভাবে যেখানে রাস্তায় কয়েক মাইল পর পর চেক্ পোষ্টে তল্লাসী চালানো হয় সেখানে মহিলাদের নানাভাবে অপদস্ত করা হয়। যদিও কোথাও কোথাও মহিলা ভিভি পি দ্বারা মহিলা যাত্রী বা পথচারীদের তল্লাসি চালানো হয় তবুও জুম্ম নারীর উপর হয়রাণির মাত্রা কখনো কমেনি। অফিস - আদালত, রাস্তাঘাটে বা হাটে বাজারে যতই জুম্ম নারীদের বিচরণ বেড়েছে ততই বেড়েছে তাদের উপর অত্যাচারের মাত্রাও।

এরশাদ সরকারের আমলে গুচ্ছগ্রামে জুম্ম জনগণকে জোরপূর্বক স্থানান্তরের কারণে জুম্ম নারীদের আরো একটি সমস্যার সৃষ্টি হয় কিছুটা উদ্বেগজনক হারে। সেটি হচ্ছে পতিতাবৃত্তি। নিজস্ব উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে দূরত্ব বেড়ে যাওয়াতে এবং নানারকম বাধানিষেধ আরোপের ফলে গুচ্ছগ্রামবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা পঙ্গু হয়ে পড়ে। তাদের এই অর্থনৈতিক দুরাবস্থার সুযোগে সামরিক ও সরকারের প্রশাসনের কতিপয় কুচক্রী মহলের প্রত্যক্ষ মদতে গুচ্ছগ্রামগুলোতে দেহ ব্যবসার জন্ম দেয়া হয় যা জুম্ম সমাজে কল্পনাও করা যায়না। শুধু গুচ্ছগ্রামগুলোতেই নয় এই পরিকল্পিত দেহ ব্যবসা থানা সদর থেকে জেলা শহর এমনকি চট্টগ্রাম ঢাকাতেও ছড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়। এতে জুম্ম দালাল গোষ্ঠিদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় স্বচ্ছন্দে নারীকে পণ্যে পরিণত করে নির্যাতনের প্রক্রিয়াটিও মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়।

জাতিগত নিপীড়নের ক্ষেত্রে সরকারসমূহ অনেক উপায় গ্রহণ করে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ অথবা নিজ ভূমিতেই সংখ্যালঘু করার ষড়যন্ত্র চলছে দীর্ঘদিন ধরে। জুম্ম জনগণের ভূমি ও স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে বানচাল করে দিয়ে তাদের গোটা অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দিতে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধ পরিকর। জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিতে. তাদের কেবল শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে চেষ্টা চালানো হচ্ছে তাই নয় ভাষা সংস্কৃতিকেও অক্টোপাসের মত আকড়ে ধরে এই প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা হচ্ছে। জুম্ম সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্বকে হারিয়ে দেয়ার কার্যক্রম চলছে সর্বত্র খুবই সুকৌশলে। আর এক্ষেত্রেও জুম্ম নারী সমাজ অন্যতম বাহন বিধায় তাদের করা হচ্ছে সাংস্কৃতিক শোষণ বা আগ্রাসনের হাতিয়ার। জুম্ম সংস্কৃতি রক্ষা ও উন্নয়নের অজুহাতে সরকার যে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্‌স্টিটিউট গঠন করেছে তাতে নারীকে করা হয়েছে শোরুম সংস্কৃতির বাহন। জুম্ম নারীদের ব্যবহার করে সংস্কৃতি চর্চাকে কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এই মেকী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও এখানে জুম্ম নারীকে পরিণত করা হচ্ছে পণ্যে এবং শোষণের শিকারে। ফলশ্রুতিতে সামগ্রিকভাবে জুম্ম নারী সমাজ আজ সীমাহীন নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

AUTONOMY FOR PEACE IN THE CHITTAGONG HILL TRACTS(CHT) BANGLADESH

The Chittagong Hill Tracts is the hilly south-eastern region of Bangladesh. It is the traditional homeland of ten multi-lingual indigenious peoples who call themselves Jummas. The area of the CHT is 10% of the total area of Bangladesh. The soil of the CHT is rich in gas and minerals, such as coal, copper and uranium. Its forest area represents 47% of the total forests of the country

In 1972, after the liberation of Bangladesh, Jumma peoples demanded recognition in the Constitution. The Constitution declares Bangladesh to be a homogeneous nation state, thus denying the identity of the Jummas. As a protest, M.N.Larma a then Jumma parliamentarian representative, boycotted the session of the parliament and organised a political party called the Jana Samhati Samiti (JSS) or United Peoples Party. The members of the party were victimized and at the end of 1972 the party went underground and formed a guerilla called the Shanti Bahini(SB).

For the last three years (August 1992 to August 1995) the dialogue between the JSS and the Government of Bangladesh for a political solution to the CHT crisis has not achieved any result except a cease -fire agreement between the SB and the Bangladesh military. The Bangladesh Governments tactics of continuous delays and unwillingness to engage in meaningful negotiation reveal that the dialogue is trick to mitigate international pressure against the Government for gross human rights violation against the Jummas in the CHT.

Since 1975 the CHT has been highly militarized . In 1984, one third of all the regular troops of Bangladesh were operating in the CHT. A conservative estimate of military presence in 1994 was more than 1 member of the security forces to every 15 Jumma people. Twenty years of military occupation in the CHT has continued to rupture and disturb life and jeopardize the survival of the Jumma peoples. In this militarized context the" population transfer policy" of the Bangladesh Government further disrupted the situation in the CHT. In the span of five years(1978 to 1983) 400,000 landless Begalees, equal to about 60% of the total Jumma population were settled in the CHT, evicting the Jummas from their homesteades and land. Bengali settlers and "security forces" are accused of being involved in large -scale human rights violations against the Jummas. Jumnmas have been subjected to genocide, ethnocide , arson, arbitrary arrest, disappearance, harassment, forced displacement and eviction . As a result of these atrocities over 10% of the total Jumma population have taken shelter in refugee camps in India, out of which over 95% are still living in inhuman condition . And those who still inhabit their homeland, live under constant threat and insecurity, so much so that, that normal everyday living is not made possible : schools shut down suddenly, the free movement of men and women are hampered, their right to earn a livehood often denied.

In this militarized situtation , Jumma women are most vulnerable to violence. Sexual violence, such as rape, gang rape, molestation and harassment is especially prevalent. In 1990, information from only one refugee camp in India indicates that 1 in every 10 of the total female population had been a victim of rape in the CHT . Over 94% of the alleged cases of rape of Jumma women between 1991-1993 in the CHT were by" security forces". Of these rape allegations, over 40% of the victims were women under 18. In this volatile situtation of the CHT, the rule of law no longer operates.Rape allegations for example are not accepted in the court systems in the CHT.

Ethnic women have special links with environment and resources, since they traditionally inhabit forested tracts of land . The role they play in the conservation of nature is thus substantive , but this role is being eroded through the destruction of forest land by the introduction of modern technology and ' counter - insurgency' measures. Also family planning is one of the priority areas of the Bangladesh Government, but the rate of permanent sterilization in the Hill Tracts is

higher than in the plainlands(60% to 20%). This can be an indication of how the Government is using ethnic women as vulnerable targets for 'ethnic cleansing'.

The CHT problem has always been recognized as a political problem in the domestic and international arena. To redress the political problem of the CHT and to maintain peace in the region , the Hill Women's federation sees political autonomy as the only solution . Political autonomy means that the CHT should become an autonomous region within the state of Bangladesh. Indigenous Jumma people will then be able to make choices for their own development and the well being of their peoples and land.

Because of this situtation, on international Women's Day 1995 in Dhaka the CHT Hill Women's Federation declared their demands by initiating a campaign called "Autonomy for Peace in the CHT". This message is now being voiced at the UN World Conference on Women and the NGO Forum on Women, in China.

We ask the support of all sisters of the world to join hands with the Jumma women's campaign for peace and political autonomy in their homeland.

****

CHITTAGONG HILL TRACTS HILL WOMEN'S FEDERATION , BANGLADESH
30th August -10 September, 1995.
UN WORLD CONFERENCE ON WOMEN: NGO FORUM ON WOMEN, CHINA

*****

List of Major Massacres in the Chittagong Hill Tracts(CHT) Bangladesh

Kanungo para, April 1979: 25 Jummas killed , 80 houses burnt.
Kaukhali, March 1980: more than 300 Jummas killed, 600 houses burnt.
Matiranga - Tabalchari, June 1981: about five hundred jummas killed ,100 houses burnt.
Bhusanchara,May 1984 more than 100 Jummas killed , 400 houses burnt.
Panchari-Dighinala-Khagrachari - Matiranga, May 1986: 500 Jummas killed, 2000 houses burnt.
Badghaichari, August 1988:38 Jummas killed hundreds of houses burnt.
Langadu, May 1989: 36 Jummas killed , hundreds of houses burnt .
Malya, February 1992 : 30 Jummas killed
Logang, April 1992: several hundreds of Jummas killed, 550 houses burnt.
Naniachar, November 1993(during the cease-fire period):
29 Jummas killed, 25 houses burnt.

* * *

ENSURE IMMEDIATE DEMILITARIZATION OF INDIGENOUS PEOPLES TERRITORIES

Many indegenious peoples traditional territories are highly militarized including the Jummas homeland, the CHT of Bangladesh, Karen. Chin's homeland of Burma, Nagaland of India etc. These militarized areas are de-facto warzones. Genocide, ethnocide, arson, arbitrary arrest , disappearance, harassment, forced displacement and eviction of indigenous peoples are common incidents in these areas.

Para 116 of the Platform of action recognizes indigenous women in the situtation of armed conflict are particularly vulnerable to violance.Sextual violance such as rape , gang rape, molestation and harassment of indigenous women is especially prevalent . Over 94% of the alleged cases of rape of Jumma women between 1991-1993 in the CHT were by"security forces" . Of these rape allegations, over 40% of the victims were women under 18.

In this militarized context, the rule of law no longer operates and economic activites are curtailed, exacerbating the problems of survival of many indigenous peoples who are already on the verge of extinction in all these areas.

It is therefore imperative that the issue of demilitarization of indigenous peoples territories should be included in the beijing Declaration.

[1) Miss Bartika Chakma And 2) Miss Kabita Chakma of 'Hill Women Federation' are making statements in the seminer on Indigenous Women of Beijing NGO Forum '95 held in Hoyio near Beijing on the Grand occasion of the World Women Conference under the auspices of the United Nations.]

WHY SHALL I NOT RESIST!
(Joli No Uddihm Kitteye)

kabita chakma

Why shall I not resist !
can they do whatever they please--
Turn settlements into barren land
Densa forests to deserts
Morning into evening
Make barren what is fertile.

Why shall I not reist !
Can they do whatever they please---
Estrange us from the land of our birth
Enslave our women,
Blind our vision
Put an end to creation.

Neglact and humiliation cause anger
The blood surges through my veins
Breaking barriers at every stroke,
The fury of youth pierces the sea of consciousness.
---I become my own whole self
Why shall I not resist !

[জাতি সংঘের উদ্যোগে গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। এ উপলক্ষে ৩০ শে আগস্ট থেকে বেইজিং অলিম্পিক স্টেডিয়ামে শুরু হয় "বেইজিং এন জি ও ফোরাম'৯৫ "-এর কর্মকাণ্ড। উক্ত এন জিও ফোরামে যোগ দিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'হিল উইমেন ফেডারেশন ' থেকে দুই প্রতিনিধি (কবিতা চাকমা ও বর্তিকা চাকমা) চীন সফর করেন। তারা বেইজিং-এর দূরবর্তী হুআইয়ো শহরে আয়োজিত "বেইজিং এন জি ও ফোরাম'৯৫" এর বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মসূচীতে অংশ নেন। যারা বিশ্বের আদিবাসী মহিলাদের (Indigenous Women) 'সংখ্যাগরিষ্ঠ , সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং রাজনীতি' ইস্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জুম্ম নারী নির্যাতনের কথা তারা তুলে ধরেন। সম্মেলনে তারা একটি প্রচার-পত্র এবং কবিতা চাকমার 'জ্বলি ন উদিম কিত্যেই' কবিতাটি ইংরেজী অনুবাদ করে বিলি করেন। উক্ত কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী সায়েন্স বিভাগের শিক্ষিকা মেঘনা গুহ ঠাকুরতা। তাদের " পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির জন্য স্বায়ত্ত শাসন" শিরোনামের প্রচারপত্র ও 'জ্বলি ন উদিম কিত্যেই' কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ উপরে ছাপানো হল।]

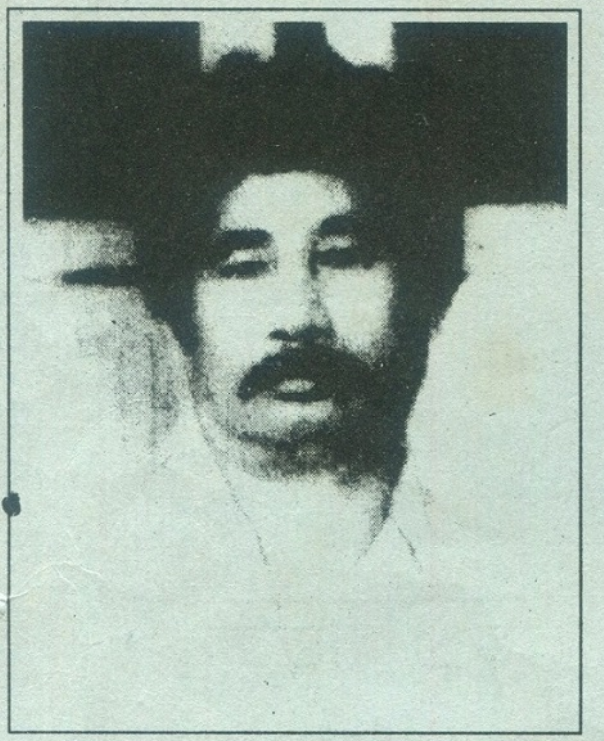

শহীদ শুভেন্দু প্রবাস লারমা (তুফান)

শহীদ অর্পনা চরণ চাকমা (সৈকত)

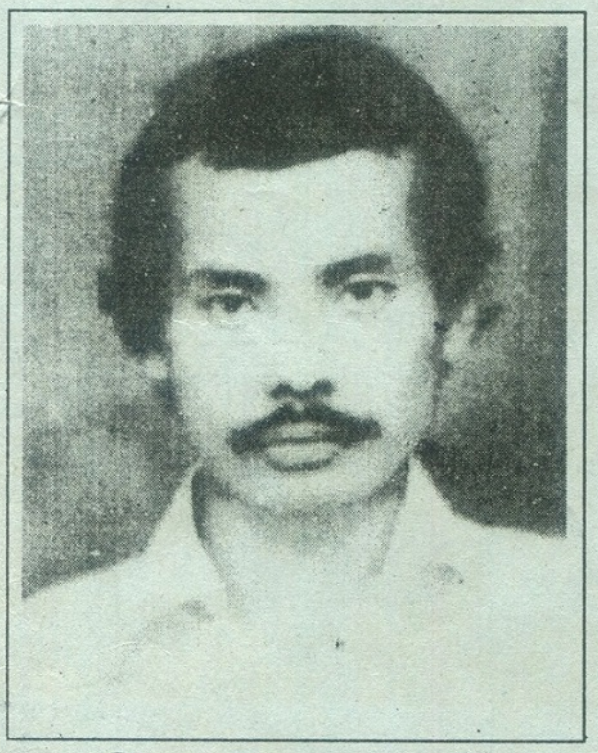

শহীদ নবরশ্মি চাকমা (সপ্তর্ষি)

শহীদ গৌরিশঙ্কর চাকমা (রোনাল)

শান্তিবাহিনীর গ্রুপ ফটো

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারণাঃ তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

শুভেচ্ছা মূল্য ১৫ টাকা